একক ২ ❒ গণস্বাধীনত্তোর যুগের ইতিহাস ঃ নেহেরু

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা ঃ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে উত্তেজনার সূত্রগুলি

২.৩ প্রস্তাবনা

২.৪ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

২.৫ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য

২.৬ সংহতির পথে ভারত ঃ রাজন্যশ)াসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি

২.৬.১ জুনাগড়

২.৬.২ কাশ্মীর

২.৬.৩ হায়দ্রাবাদ

২.৭ সংহতির পথে ভারত ঃ পণ্ডিচেরী ও গোয়া

২.৮ সংহতির পথে ভারত ঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি

২.৯ সংহতির পথে ভারত ঃ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংকট

২.১০ সংহতির পথে ভারত ঃ উপজাতীয় নীতি ও উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

২.১১ গণতন্ত্রের পথে ভারত

২.১১.১ গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে

২.১১.২ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি

২.১১.৩ নির্বাচনী পদ্ধতির সূচনা

২.১২ উপসংহার

২.১৩ অনুশীলনী

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

স্বাধীনোত্তার ভারতের যে অধ্যায় পরিচালনার গুরুভার জওহরলাল নেহরুর ওপর অর্পিত হয়েছিল, তাকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ কবরে পাঠ করব। প্রথম পর্ব, ১৯৪৭—১৯৫২ ছিল গঠনমূলক অধ্যায়—আত্ম অন্বেষণ ও পারস্পরিক মূল্যায়নের অধ্যায়। এই পর্বের আশু কর্তব্য ছিল, W. H. Morris-Jones-এর ভাষায়, সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ (মানব সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ) দৃঢ়ভাবে একত্রিত করা, অস্তিত্ব (রাষ্ট্রের) সুনিশ্চিত করা, (স্বাধীনতার) উন্মুক্ত সমুদ্রে (রাষ্ট্র) জাহাজকে ভাসমান রাখা। ("The task, is to hold things together, to ensure survival, to get accustomed to the feel of the open sea, to see to it that the vassels keep afloat.") অর্থাৎ, এই পর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র-নায়কদের প্রধনা কর্তব্য ছিল সদ্যজাত রাষ্ট্রটির ঐক্য ও সংহতি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রক্ষা করা। স্বাধীনতার এই পরীক্ষার কালে যে সমস্যাগুলি দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল নেগুলি হল— দেশীয় রাজন্যগুলির অন্তর্ভুক্তির সমস্যা, ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠনের দাবী, সরকারী ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ও উপজাতি জনসমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। সবগুলি সমস্যার নিষ্পত্তি যে এই পর্বের মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই পর্বে রাষ্ট্রনায়কদের সব থেকে বড় কৃতিত্ব ছিল সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও ঐক্য সুরক্ষিত করা। নেহরুর গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারণের নীতি এই কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ ১৯৫২ পরবর্তী সময় ক্রিয়াশীলতার দ্বারা চিহ্নিত। এই পর্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট অবয়বপ্রাপ্ত হয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করে। এই সমসয় একাধারে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির যুক্তিগ্রাহ্য সমাধা হয়েছিল, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২.২ ভূমিকা ঃ ভারতীয় সমান ও রাজনীতিতে উত্তেজনার সূত্রগুলি

ভারতবের্ষর ভাষাগত, ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতি বৈত্রি প্রাবাদপ্রতিক। অনুরূপভাবে সহিংস সংঘাত ও বিরোধ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে জাতিগত বা সংস্কৃতিগত বৈরিতা কিন্তু বৈচিত্র থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়নি। সংঘাতের সূত্রগুলি

খুঁজতে হবে অন্যত্র। ১৯৭১-এর আদমসুমারী ৩৩টি ভাষা তালিকাভুক্ত করেছে, যার মধ্যে ১৫টি রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮১-র আদমসুমারী শতাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রা এক কোটরও অধিক উপজাতি জনসমূহের অস্তিত্ব নথিভুক্ত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেস পাদ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীরগুলি বারবার রাজনৈতিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যার মধ্যে বেশ কিছু সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। এই আন্দোলনগুলি কখনো অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, কখনো সংশিলষট রাজন্যসরকার, কখনো বা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পরিচাতিে হয়েছে। চরিত্রগত দিক তেকে, উপজাতি জনসমূহ কখনো মার্বাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সমর্থনপুষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদে শ্রেণী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো উপজাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে নিছক রাজনৈতিক দাবিদাওকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করেছে। অপরদিকে এমনও অনেক উপজাতি সম্প্রদায় আছে যারা অদৌ বিদ্রোহের পতে পা বাড়ায়নি। জাতি ও জাতিগত বৈরিতাও ভারতীয় সমাজকে বহু অংশে খণ্ডিত করেছে। আবার, এক অঞ্চল থেকে অপর একটি অঞ্চলে অভপ্রয়াণ, বিশেষ করে, অসমের মত স্বল্প জন-ঘনত্ব বিশিষ্ট আদিবাসীর এলাকায় অথবা দিল্লী, মুম্বাইয়ের মত মহানগরীতে স্থানান্তর অনেক ক্ষেত্রে অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত করে।

ভাতীয় রাজনীতিতে জাতিগত ও সাংস্কৃতিগত আন্দোলনগুলির উফস বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় যে ঔপনিবেশিক তথা উত্তর ঔপনিবেশিককালে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ সরকার পূর্ব ভারতে অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার প্রতি পক্ষপাত্তি করছিল এবং উত্তর ভারতে হিন্দির বদলে উর্দুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা মুসলিম ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন করেছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাও প্রদান করেছিল। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদে সরকার মধ্যভারতে সমতলভূমির বাসিন্দাদের আদিবাসী এলকায় প্রচরণ করতে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু একই স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তারাপূর্বভারতে অনুরূপ স্থান্তরে বাধা দিয়েছিল। উপরন্তু, দক্ষিণ ভারতে যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেহেতু ইংরেজ সরকার সেখানে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনে মদত দিয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধের স্বীকৃতির ভারসাম্য পরিবর্তন করতে প্রয়াসী হয়। উর্দচর স্থলে হিন্দী ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। অসমে বাংলাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসমিয়া একমাত্র সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। মুসলিম ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচনকেন্দ্র নীতিগতভাবে বর্জন করা হয় কিন্তু সংসদে, প্রশাসনে ও শিক্ষাকেন্দ্রে তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য াসন সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সমাজে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রভাব বিপরীত ধর্মী। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

অপরদিকে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। আবার ক্ষেত্রে বিশেষে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রতিশোধমূলক অন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্বীকৃত কিন্তু ‘‘পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়’’গুলির তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের প্রদত্ত সমান সুযোগ সুবিধার দাবিতে অসংখ্য আন্দোলন এই পর্যায়ভুক্ত।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতি ও রাজতৈিক কৌশল জাতিগত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নেহরুর যুগে প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতিগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বহুত্ববাদী নীতি (Pluralist Policy) অনুসরণ করে প্রধান ভাষা গোষ্ঠীগুলির ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবিকে মর্যাদা দিয়েছিল। একই সঙ্গে কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে জাতপাত বা ভাষাভাষীর দ্বন্দেব কেন্দ্রীয় সরকার সচেতনভাবে উভয় পক্ষ থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখেছিল। আবার রাজ্যগুলি যখন ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, তখনও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

ভারতীয় সমাজে টানা পোড়েনের অপর একটি উৎস বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রগতির অসম হার। এর ফলে চাকুরি, শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে জাতি দাঙ্গার আকার ধারণ করেছে।

২.৩ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস সময় ও দেশ বিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কোথাও দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্পর্ক বিবর্তিত হয়, আবার কোথাও কোন বড় মাপের বৈপ্লবিক পরিবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়। দ্বিতীয় পরিস্থিতি, অর্থাৎ, সরকার পরিবর্তন তিনভাবে উদ্ভূত হতে পারে— অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান, বৈদেশিক শাসন স্থাপন অথবা তার অবসান। আধুনিক ভারত রাষ্ট্র তৃতীয় শ্রেণীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এরূপ রাষ্ট্রের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মুখ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে সদ্যজাত রাষ্ট্রটির আথ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির সূচনা করে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ (যাঁরা স্বাধী ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিলেন) জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার লক্ষ্য হবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার, অর্থাৎ সেই সমস্ত আদর্শ বা লক্ষ্য যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ ছিল না। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব অচিরেই স্বাধীনতার

উদ্দীপনাকে ম্লান করে দিয়েছিল। ১৪ই আগস্ট প্রদত্ত একটি ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "যে কীর্তি আজ আমরা উদ্‌যাপন করছি তা একটি পদক্ষেপমাত্র, বৃহত্তর সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জনের চাবিকাঠি......আগামী দিগুলি স্বস্তির বা আরামের নয় বরং বিরামহীন পরিশ্রমের যাতে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারি।" ("The Achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumph and achievements........That future is not one of ease and resting but of incessant striving so that we may fulfil the pledges we have so often taken.') স্বাধীন ভারতে তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবী করেছিল রাজ্যনশাসিত অঞ্চলগুলির সংহতির সমস্য, দেশব্যাপী সাম্প্রদায়কি দাঙ্গা, ৬০ লক্ষ পাকিস্তানী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ও তেলেঙ্গানার কমিউনিষ্ট আন্দোলন। ঘটনাবলীর আকস্মিক সমাবেশের ফলে নতুন রাষ্ট্রের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ বর্তায় জওহরলাল নেহরু পরিচালিত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে যাদের প্রাথমিক কর্তব্যই ছিল দৃঢ়ভাবে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মাঝারি মাপের সমস্যাগুলি ছিল সংবিধান প্রস্তুত করা, প্রতিনিইদত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা, এবং সামগ্রিক ভূমি সংস্কারের বাধ্যমে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার অবসান ঘটান। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলি ছিল জাতীয় সংহতি সাধন, জাতি গঠন, দ্রুতলয়ে অর্থনৈকি উন্নয়ন সাধন, দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং যোজনা পদ্ধতির রূপায়ণ। পাহাড় প্রমাণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে জাতি গঠনের পথে স্বাধীন ভারত যখন তার যাত্রা শুরু করেছিল, তার পুঁজি ছিল জওহরলাল নেহরুর যোগ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি একদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সি. রাজাগোপালাচারীর মত তীক্ষ্ণধী নেতৃবৃন্দ, এবং অপরদিকে রাজ্যস্তরে উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, পশ্চিম বাংলার ড. বিধানচন্দ্র রায়, বোম্বের বি. জি. খের ও মোরারজী দেশাই-এর মাপের রাজনীতিবিদ, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় যাঁদের যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ছিলেন সমাজবাদী মতাদর্শী আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং দলিত নেতা ড. বি আর আম্বেদকর। রাষ্ট্রের দু'টি মুখ্য উদ্দশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তন। ১৯৪৭-এর ভারত রাষ্ট্র ছিল দু'টি পরস্পর বিরোধী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক; ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য।

২.৪ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

একাধিক দিক থেকে স্বাধীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উত্তরলব্ধি। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা। এই সচেতনতার অভাবই

সাধাররত নতুন রাষ্ট্রগুলির সামনে সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ভারত হয়ত ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। কারণ সংখ্যাগত দিক থেকে সরকার ছিল ক্ষুদ্র এবং সব থেকে বিবেকবান জেলাশাকও সম্ভবত তাঁর এলাকাভুক্ত কিছু গ্রা অপরিদর্শিত রেখে দিতেন সময়ের অভাবে। কিন্তু প্রতিটি গ্রামেই মোড়ল ও পাটোয়ারস্থানীয় লোকেরা গ্রামীণ স্তরে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেনঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব ছিল সুদূর, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রামীণ মানুষের কাছে ছিল বিস্ময়জনক এবং তার সর্বময় অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। তাদের চোখে সরকারের ভূমিকা ছিল বৈপরীত্যে ভরা—সে একাধারে দাতা ও গ্রহীতা, রক্ষক ও ভক্ষক (কর-গ্রংগ্রাহক)। সবথেকে লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল এই যে সরকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব ছিল শ্রদ্ধাসূচক এবং শক্তিশালী সরকারের অস্তিত্ব তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। এই সচেতনতা সেয শুধুমাত্র গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, শহুরে জনতার কাছে সরকার ছিল অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি দৃশ্যমান অস্তিত্ব, অতএব অনেক বেশি সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু সরকারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারাও ছিল সমধিক সচেতন। শহুরে বুদ্ধিজীবীদের চোখে সরকার ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার দিকে তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন তাঁদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য। শাসনতন্ত্রের এই গ্রহণযোগ্যতা থেকেই একটি নূতন রাষ্ট্র তার জয়যাত্রা শুরু করতে পারে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুধু যে শাসনতন্ত্রের গহণযোগ্য মানসিকতাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাই নয়, আরো সুনির্দিষ্টরূপে পেয়েছিলেন প্রশাসন যন্ত্র ও উপকরণসমূহ। এই উপকরণগুলি ছিল প্রথমত, সাংগঠনিক, কাঠামো ও পদ্ধতিগত, এবং দ্বিতীয়ত, কর্মী বিষয়ক।

আধুনিক ভারতে সংবিধানকে যদি সুস্টষ্ট ঐকিক লক্ষণযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে ১৯৪৭-এ ঔপনিবেশিক ুগের উত্তরাধিকারস্বরূপ যে সংবিধান সে লাভ করেছিল তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রয় বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ঐকিক ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মত যুক্তরাষ্ট্রীয়, ব্যবস্থাও ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন অতি সামান্য পরিমানে হলেও জনপ্রতিনিধিত্ব পীতি প্রবর্তন করেছিল। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার ও ভারতীয় পরিষদ আইন এবং ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোট ও ভারত শাসন আইন এই প্রবণতাকে আরো অগ্রসর করেছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রতিনিধিত্বমূলক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার এই বিবর্তনের উপান্ত এবং ১৯৫০-এর স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই ধারায় চূড়ান্ত পরিণতি। উল্লিখিত প্রতিটি সাংবিধানিক সংস্কারই কেন্দ্রীয় এবং আইন পরিষদে এবং নির্বাহিক পরিষদে ভারতীয়দের বৃহত্তর অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং জনসংখ্যার ক্রমবর্থমান অংশকে ভোটাধিকার অর্পণ করেছিল।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্তা ছিল জেলাকেন্দ্রিক। একাধিক জেলার সমন্বয়ে গড়ে উঠত একটি প্রশাসনিক বিভাগ, এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হত একটি প্রদেশ। আবার, প্রতিটি জেলাই একাধিক

উপবিভাগে বিভক্ত হত, এবং উপবিভাগগুলির ক্ষুদ্রতর একক ছিল তেহসিল বা তালুক যা আবার একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। নিজস্ব পৌর প্রশাসন আছে এমন বড় শহর ব্যতীত সব্র দেশেই এই কাঠামোর ভিত্তিতে প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারত এই জেলাভিত্তিক শাসন কাঠামো গ্রহ করেছিল। এ হেন প্রশাসনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বিভাগীড মহাধ্যক্ষ, সমাহর্তা অথবা জেলা-প্রশাসক অথবা উপ-মহাধ্যক্ষ, উপবিভাগীয় আধিকারিক। তেহসিলদার বা মমলতদার জাতীয় থানীয় সার্বিক কতৃত্ব ও দায়িত্বসম্পন্ন একজন পদাধিকারী আমলার উপস্থিতি এবং পাশাপাশি জেলা আবক্ষাধ্যক বা মুখ্য যন্ত্রবিদের মত একজন বিশেষজ্ঞ আধিকারিকের উপস্থিতি যিনি প্রাদেশিক স্তরে সরকারের উপযুক্ত বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। সরকারের অগ্রগণ্য কর্তব্য ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগ্র। এর সঙ্গে খনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার-বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে কতলব্যের দৃঢ় পৃথকীকরণের অভাব। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার একটা প্রবণতা ছিল একই আধিকারিকের মধ্যে দুই ধরনের ক্ষমতার কিয়দংশে সমাবেশ ঘটানো। সুতরাং জেলাশাসক ছিলেন একাধারে সমাহর্তা, বিচারক এবং প্রশাসন। কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি লর্ড রিপনের সংস্কারকামীতা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৮৮২-র পর থেকে জেলাও তন্নিম্নস্তরের বেসরকারী সদস্যদের একটি পরিষদ সৃষ্টি করেছিল যার সদস্যরা প্রথমে মনোনীত এবং পরবর্তীকালে নির্বাচিত হতেন। সুতরাং দেকা যায় যে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা চিল পদমর্যাদা অনুযায়ী নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্তর সমন্বিত একটি সংগঠন। উত্তরাধিকারস্বরূপ স্বাধীন ভারত এই জেলাভিত্তিক শাসন কাঠামো লাভ করেছিল কিন্তু এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জেলাগুলিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিরও একক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

ইংরেজ সরকারের কর্মীবৃন্দের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে সব থেকে মৌলিক, অগ্রগণ্য ও উৎকৃষ্ট পদ ছিল ভারতীয় (অসামরিক) প্রশাসনিক কৃত্যক (Indian Civil Service)। যে দেশে সরকারী চাকরির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে যথাযোগ্য সম্মান, সেখানে সর্বোচ্চ বিভাগের সদস্যপদ মানুকে সমাজের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করত। এই পদ ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতার একচেটিয়া আধার। আমলাদের এই স্তর থেকে শুধুমাত্র জেলা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারকরাই মনোনীত হতেন না, অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রাদেশিক নির্বাহিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বড়লাটের নির্বাহিক পরিষদের অধিকাং সদস্য এবং ভারত সচিবের ভারত পরিষদের কিছু সদস্যও কৃত্যক পদ থেকে মনোনীত হতেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি হত। এই পদের ভারতীয় সদস্যদের, যাঁদের বলা হত ব্রিটিশ রাজের "ইস্পাত কাঠামো" স্বাধীনতা উত্তর কালেও বজায় রাখা হয়েছিল এবং এরই আদলে প্রচলিত হয়েছিল ভারতীয় জনপালন কৃত্যক (Indian Administrative Service) নামক একটি নূতন পদ। দলের অভ্যন্তরে নেহরু যতই নীতিগত বিরোধে কোণ ঠাসা হয়ে পড়তে থাকলেন, ততই তিনি এই শ্রেণীর আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এই নির্ভরশীলতা সদামঙ্গলময় ছিল না কারণ আমলাতন্ত্রে

ভারতীয়করণ ঘটলেও, দায়িত্বজ্ঞান ও সংবেদনশীলতার অভাব ব্রিটিশ আমলের মতই স্বাধীন ভারতের আমলাদেরও বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্বাধীন ভারতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন ধারা। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে স্বাধীন ভারত আরও লাভ করেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী একটি সামরিক সংগঠন। নীতিগতভাবে ইংরেজ শাসনকরা এমন এক সামরিক সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যা চূড়ান্তভাবে পেশাদারী, রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রানাধীন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নেতারা এই ঐতিহ্য সাদরে গ্রহণ করেছিলেন ও লালন করেছিলেন। ঠিক এই কারণেই, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত ভারতবর্ষে সামরিক শাসন কোনদিন গণতন্ত্রকে অবদমিত করতে পারেনি।

জেলাভিত্তিক সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃতযক (Indian Civil Service) এবং সর্বভারতীয় আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজ শাসন একদিকে যেমন ভারতবর্ষের ঐক্য সাধন করেছিল এবং সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, অপরদিকে তারাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা অনেকাংশে সাম্রাজ্যবাী ভেদনীতির বিষফল; সব শ্রেণীর ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্ভবনায় ভীত সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যাতেই ইন্ধন দেয়নি, বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সংঘাতে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গকে সমর্থন করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই হস্তান্তরিত হয়েছিল এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজ।

২.৫ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ তার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো যদি প্রাক্‌ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ থেকে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে তার নিজস্ব স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে গ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত মূল্যবোধ, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী যা ছিল জাতি গঠনের প্রয়া তার মূল প্রেরণা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন ভারতের উনয়ন ছিল নেহরুর ভাষায় ‘‘এক ধারাবাহিক বিপ্লব’’ যার দুই অধ্যায়ের যুগসূত্র ছিল এই আদর্শগুলি। শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদীরা বুঝেছিলেন যে জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ভারত নবাগত। তাঁদের ভাষায় ভারত তখনও ছিল একটি ‘‘উদীয়মান জাতি’’। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অতএব প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বভারতীয় চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

সাম্প্রদায়কি ভিত্তিতে দেশের বিভাজন জাতীয়তাবাদী নেতলবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু অন্তর থেকে গ্রহণ করেননি। অতএব স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ ধ্যান ধারণা ও লক্ষ্যগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছিল জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নেহরু ও তাঁর সমসাময়িক নেতারা সর্বপ্রকার জাতপাতগত, ধর্মীয়, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন; যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে অবৈধ বলে গণ্য করা এবং প্রয়োজন বলপ্রয়োগে দমন করা; ধর্মের ভিত্তিতে কোন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবীকে স্বীকৃতি দান তেকে বিরত থাকা।

ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত বৃহত্তম গণ আন্দোলনের নজির। গান্ধীজীর দেতৃত্বে এই আন্দোলন সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেছিল, যার দ্বৈত স্তম্ভ ছিল জনগণের একাংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিষ্ক্রিয় অংশের সহানুভূতি ও সমর্থন। এই অহিংস বিপ্লবে জনগণের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তথা সার্বভৌম ভারতীয় গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের জনসাধারনের রাজনৈতিক চেতনার ওপর আস্থা রাখতে সাহায্য করেছিল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানে উৎসাহ দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারনের নাগরিক অধিকার ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গোড়া থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী ছিল এবং সর্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদীরা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল সংগঠন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। প্রতিটি স্তরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর। দলের অভ্যন্তরে বিরোধী মতাবলম্বীদের মত প্রকাশের পূর্ন স্বাধীনতা ছিল। বাস্তবে তর্ক-বিতর্ক কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গরতান্ত্রিক-কর্মপদ্ধতি কিন্তু শুধুমাত্রই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন যথা, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষানসভা, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও নারী সংগঠনগুলিও একই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নাগরিক অধিকারসমূহের প্রতি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বস্ত ছিলেন। লোকমান্য তিলক একদা দাবী করেছিলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতা একটি জাতিকে সৃষ্টি করে ও তাকে পুষ্ট করে।" ১৯২২-এ গান্ধীজী ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৯-এ তিনি বলেন, "অহিংসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক স্বাধীনতা স্বরাজের প্রথম পদক্ষেপ।" ১৯৩৬-এ নেহরু লিখেছিলেন, "নাগরিক স্বাধীনতা অবদমিত হলে একটি জাতি তার প্রাণবত্তা হারায় এবং বলিষ্ঠ কোন ভূমিকা পালনে অযোগ্য

হয়ে পড়ে।" নাগরিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে বিরোধী গোষ্ঠীগুলিও একে অপরের নাগরিক অধিকারকে সমর্থন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতারা তিলকের মত চরমপন্থী মতাদর্শী নেতার ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের দাবীকে সমর্থন করেছিলেন। আবার, অহিংসায় বিশ্বাসী কংগ্রেস নেতারা লাহোরে বিচারাধীন ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন কমিউনিস্টদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯২৮ সালে ইংরেজ সরকার যখন বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি দমন করার অভিপ্রায়ে 'জন নিরাপত্তা আইন' ও 'শিল্প বিরোধ আইন' প্রণয়ন করেছিল, তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় শুধু মতিলাল নেহরুই এই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করেননি, মদনমোহন মালব্য এবং এম, আর জয়াকরের মত রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এবং ঘনশ্যামদাস বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত পুঁজিবাদী মুখপাত্রও সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বিদ্রোহী কৃষক শ্রমিক, ছাত্র এমনকি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মত প্রগতিশীল ও চরমপন্থী গোষ্ঠী ও দলকেও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করতে দ্বিধা করেনি। সুতরাং বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক কাঠামোর বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি বিশ্বস্ত এই বিকল্প ব্যবস্থার সারমর্ম ছিল মতানৈক্যের প্রতি যথার্থ সম্মান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তর্ক-বিতর্কের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতানুযায়ী কর্ম সম্পাদন এবং সংখ্যালঘু মতের অস্তিত্ব ও বিকাশের অধিকার।

স্বাধীন ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠও গ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। জওহরলাল নেহরুই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ দেখেছিলেন। যদিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত রণনীতি অবলম্বন করতে পারেনি, তবুও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ : রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিধি থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ, সমস্ত ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা অথবা সমান সম্মান প্রদর্শন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণের অনুপস্থিতি, এবং সাম্প্রদায়িকতার সক্রিয় বিরোধিতা।

একটি গণ-আন্দোলনে জনগণের বৃহত্তর অংশকে উদ্বুদ্ধ করতে আদর্শের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার সংগ্রামের স্বার্থেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শকে নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের পথ সযত্নে এড়িয়ে আন্দোলনকে হতে হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মূলত যার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। বৃহত্তর লক্ষ্যে উন্নীত

হবার স্বার্থে বিভিন্ন মতাদর্শের সহাবস্থান তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল। সহাবস্থান ও সহনশীলতার এই ঐতিহ্য স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা সাদরে লালন করেছিলেন।

স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য সংবিধান পরিষদে জাতীয়তাবাদীরা ''শক্তিশালী কেন্দ্র'' ও ''শক্তিশালী রাষ্ট্রের'' প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাষ্ট্রকে তাঁরা দেখিছিলেন বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীন, সার্বভৌম অস্তিত্বের মুখপাত্রস্বরূপ। রাষ্ট্র বহির্শক্র ও আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দেশের ক্যৈ সুরক্ষিত করবে, সমাজে শৃঙ্খলা ও অআইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, এবং কেনদ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে শতাব্দীর অনগ্রসরতা থেকে তাকে মুক্তি দেবে।

২.৬ সংহতির পথে ভারত ঃ রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে নেহরু আমলের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল আঞ্চলিক পুনর্গঠন। দু'টি ধাপে আঞ্চলিক পুনর্গঠন সাধিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সামনে প্রথম সমস্যা ছিল একটি অভিন্ন সর্ববারতীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় রাজন্য-শাসতি রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঔপনিবেশিক যুগে দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত ৫৬২টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যে ভারতের ৪০% ভূখণ্ড অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে এই রাজ্যগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাধীনতা উপভোগ করত। ১৮৫৮ সালে যখন সমগ্র ভারতীয় ভুখণ্ডে ব্রিটিশ সম্রাটের অধিরাজত্ব কায়েম হয়, তখন সম্রাট ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা 'সর্বময় কর্তৃত্ব' বা 'পরমোক্ষতা' নামে অভিহিত হয়। সম্রাট অনেকরকম চুক্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। সেসব চুক্তির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশীয় রাজন্যগুলির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যাস্ত ছিল আর সম্রাট তাদের বহিঃসম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত তিনটি কারণে স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম, কিছু শাসকের স্বাধীনতা স্পৃহা। দ্বিতীয়, এই স্বাধীনতা স্পৃহায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ক্লীমেন্ট অ্যাটলি, যিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭-এ ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে দেশীয় রাজাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার রাষ্ট্রগুলির হাতে বর্তাবে না। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি দাবি করল যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে তারা স্বাধী হয়ে যাবে। তৃতীয়, দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা স্পৃহা আরও উৎসাহিত হয়েছিল যখন মহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুন জনসমক্ষে ঘোষণা করেন ব্রিটিশ আধিপত্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ মনোভাব অবশ্য

অচীরেই পরিবর্তিত হয়, এবং ১৯৪৭-এর ভারত শাসন আইনের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যাটলী বলেন, ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাশা করে যে দেশীয় রাজাগুলি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দুটি ডোমিনিয়নের একটিতে তাদের যথাযোগ্য স্থান খুঁজে নেবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ়। দেশীয় রাজ্যগুলির এই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এই প্রবনতা স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রতিকূল ছিল। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে জাতীয়তাবাদী আবেগ এই সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার করে এসেছিলেন যে শাসকশ্রেণী নয়, বরং জনসাধারণই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। রাষ্ট্র নির্মাণের পথে নেমে তাঁরা স্বভাবতই রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা স্পৃহা অগ্রাহ্য করে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন যে আঞ্চলিক নৈকট্য ও জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে দেশীয় রাজাগুলির একমাত্র পথ ছিল ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তি। এর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির দাবিতে এই রাজ্যগুলিতে জেগে ওঠে উত্তাল গণ-আন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ভারতীয় রাজনীতির 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ওপর। "নির্ধারিত দিন" অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যে অধিকাংশ রাজন্য শাসিত এলাকাই ভারতীয় অধিরাজ্যে যোগ দেয়। ব্যতিক্রম থেকে যায় শুধু জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ।

২.৬.১ জুনাগড়

সৌরাষ্ট্রের উপকূলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জুনাগড়। চতুর্দিকে ভারতীয় ভূভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই রাজ্যের পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরূপ ভৌগলিক নৈকট্য ছিল না। প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্যসমূহ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যের অধিবাসীরা, অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ভারতের সঙ্গে একীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই সমস্ত বাস্তব পরিস্থিতি অস্বীকার করে জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাকিস্তান এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও জুনাগড়ের জনগণ বিদ্রোহ করে। কংগ্রেস নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির দাবিতে এখানে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে জুনাগড়। কারণ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেখানে জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন, সেখানে জিন্না ভৌগলিক অবস্থান বা জনসংখ্যার জাতিগত গঠনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ক্রমাগত প্রচার করতে থাকেন যে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান প্রতিটি দেশীয় রাজ্যকে ভারত অথবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। জুনাগড় সমস্যা একটি বৃহত্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে : স্বাধীনতা এক কর্তৃপক্ষ থেকে অপর কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতার বৈধ হস্তান্তর মাত্র, না, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি? যাই হোক, গণআন্দোলনের চাপে জুনাগড়ের নবাব দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এখানে একটি অস্থায়ী

সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহনওয়াজ ভুট্টো ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত জুনাগড়ে সেনা পাঠায়, একটি গণভোটের আয়োজন করে, এবং জনগণের মতানুসারে ভারতের সাথে সংযুক্তিসাধন করে।

২.৬.২ কাশ্মীর

কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। জটিলতার উৎসগুলি ছিল ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সাথে কাশ্মীরের সাধারণ সীমানা। কাশ্মীরের শাসক হরি সিং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু জনসংখ্যার ৭৫% মুসলিম। ভারতে গণতন্ত্র এবং পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতাকে ভয় পেয়ে হরি সিং উভয়ের থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে স্বাধীনভাবে শাসন করতে প্রয়াসী হন। এদিকে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে National conference ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু কাশ্মীর অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা করেননি। তাঁদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাঁরা কাশ্মীরের অধিবাসীদের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। অপরদিকে পাকিস্তান শুধু গণভোটের নীতি অস্বীকারই করেনি, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে জনমত লঙ্ঘন করেছিল। ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৭-এ যখন বেশ কিছু পাঠান উপজাতি পাকিস্তানের পরোক্ষ মদতে কাশ্মীর আক্রমন করে শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হয়, কাশ্মীরের মহারাজা আতঙ্কিত হয়ে ভারতের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। কাশ্মীরের এই আপৎকালেও কিন্তু নেহরু জনমত যাচাই না করে অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন বলেন যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির পরে। সর্দার প্যাটেল ও শেখ আবদুল্লাও অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকেন। অতএব ২৬শে অক্টোবর মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং শেখ আবদুল্লার প্রধানমন্ত্রীত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। যদিও কাশ্মীরের মহারাজা এবং শেখ আবদুল্লা উভয়েই দৃঢ় ও চিরস্থায়ী সংযুক্তিকরণ চেয়েছিলেন, ভারত তার গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন অব্দি বিষয়টিকে মুলতুবি রাখে।

কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির পর ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদ শ্রীনগরে সেনা প্রেরণ করে। আক্রমণকারীদের শ্রীনগর থেকে অপসারণ করা হলেও তারা কিছু অঞ্চল দখল করে রাখে। মাসাধিককাল ধরে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলার পর যখন পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের আকার ধারণ করার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন নেহরু মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তাপরিষদের কাছে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করে (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭) পাকিস্তানের পশ্চাদপসরণ দাবি করেন। পরবর্তীকালে নেহরু এই সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। কারণ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। ভারতের অভিযোগ সম্পূর্ণ

অস্বীকার করে “কাশ্মীর সমস্যার” নাম দেওয়া হয় “ভারতপাক বিবাদ”। জাতিপুঞ্জের একটি প্রস্তাব অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই যুদ্ধবিরতি মেনে নেয় (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮), কিন্তু যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর কাশ্মীর আজও বিভাজিত হয়ে আছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার অপর পারে পাক অধিকৃত অঞ্চলে আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তানের তরফ থেকে সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও নেহরু যুদ্ধ বিস্তার না করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ভারতবর্ষের বিশেষ স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল কতগুলি সাধারণ বিবেচনায়। প্যারিস ও লণ্ডন সফরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বোঝেন যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মর্যাদা অনেকাংশেই তার হাদ্রাবাদ ও কাশ্মীর নীতির উপর নির্বরশীল। তিনি অচিরেই বুঝেছিলেন যে দলের অভ্যন্তরে এবং বিরোধীদের কাছে তাঁর কাশ্মীর নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তবে সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের সন্দেহ ও ভীতি নিরসনে যুদ্ধবিরতির ভূমিকা।

১৯৫১ সালে জাতিপুঞ্জ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে যে পাক সেনাবাহিনীর অপসারণের পরই কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু গণভোটের পরিল্পপনা বাস্তাবায়িত হয়নি কারণ পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথে মূল অন্তরায় কাশ্মীর। ভারত কাশ্মীরের আন্তর্ভুক্তিকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করে ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে প্রচার করার নীতি অনুসরণ করে। নেহরুর পরিকল্পনায় ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার গৌরবময় সাফল্যের ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান বলবৎ করা হয়। ভারতীয় রাজ্য সংঘের অভ্যন্তরে জম্মু কাশ্মীরই একমাত্র রাজ্য যাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সংবিধানের সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে ভারতের সংবিধানের উপবন্ধ অনুসারে কেন্দ্রীয় সংসদের এই রাজ্যের জন্য যে সব বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেইসব বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে রাজ্যের নির্বাহিক ও বিধানিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে।

২.৬.৩ হায়দ্রাবাদ

ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজন্যশাসিত রাজ্য হাদ্রাবাদ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভুখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। হায়দ্রাবাদের নিজাম ভারতের অঙ্গীভূত না হয়ে স্বাধীন মর্যাদা দাবি করেন এবং পাকিস্তানের উৎসাহে সেনাবাহিনী সম্প্রসারণ করতে থাকেন। সর্দার প্যাটেল সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেও স্পষ্টভাষায় জানিসেয় দেন যে ভারত তার ভৌগলিক ক্ষেত্রের মধ্যে এমন কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বরদাস্ত করবে না বা তার কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলবেঙ্গ ভারত সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তির ছত্রছায়ায় নিজাম তার বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেবেন এই আশায় ভারত

সরকার ব্রিটিশ আইনজ্ঞ স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটনকে নিযুক্ত করে তার হয়ে নিজারেম সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য। হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেহরু বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ ভারতের কাশ্মীর নীতির উপর হায়দ্রাবাদের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং দুটি বিষয়ই জাতীয় সীমা অতিক্রম করে পাকিস্তানের সঙ্গে সামগ্রিক সম্পর্কের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে হাদ্রাবাদের অভ্যন্তরে তিনটি ঘটনা ঘটে যা ভারত সরকারকে তৎপর হতে বাধ্য করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে একটি মুসলিম সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গংগঠনের উত্থান হয়—ইত্তিহাদ-উল-মুসলিমিন। ঐ সংগঠন ও তার আধা সামরিক বাহিনী রাজাকর ঐ রাজ্যের হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। রাজাকর আক্রমণ ও সরকারী দমননীতির মুখে জনগণ পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, নিজামকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য করতে হায়দ্রাবাদ রাজ্য কংগ্রেস একটি শক্তিশালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারী নিপীড়নের মুখে এই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। তৃতীয়ত, ১৯৪৬-র দ্বিতীয়ার্ধে থেকেই এই রাজেযর তেলাঙ্গানা অঞ্চলে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্বে এই আন্দোলন নিজামের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনার পাশাপাশি নিজামের অস্ত্র আমদানি অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হায়দ্রাবাদে সেনা প্রেরণ করে; তিনদিন পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সেনাপতি এস্ ইদ্রুস্ ভারতীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিজামের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে ভারত সরকার তাঁকে হাদ্রাবাদের আনুষ্ঠানিক শাসক বা রাজপ্রমুখ রূপে স্বীকৃতি দেয়; পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রাজভাতা বরাদ্দ করে এবং নিজামের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে হায়দ্রাবাদের সংযুক্তি দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় সংঘের সঙ্গে একীকরণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে। আসমুদ্র হিমাচল ভারত সরকারের পরোয়ানা বলবৎ হয়। হায়দ্রাবাদ অধ্যায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় আবার একবার ঘোষণা করে। হায়দ্রাবাদরে অগনিত মুসলিম প্রজাই যে শুধু নিবাম বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাই নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে মুসলিম অধিবাসীরা ভারতীয় নীতি সমর্থন করে পাকিস্তান ও নিজাম উভয়কেই নিরাশ করেছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল অপেক্ষাকত কঠিন। ভারতীয় অধিরাজ্যে যোগদানের পর এই রাজ্যগুলি নিয়ে ভারত সরকারের দুরকম সমস্যা দেখা দেয়। এক, দেশীয় রাজ্যগুলি যাতে কিছুটা বড়ো আয়তন বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রশাসনিক একক হিসাবে টিকে থাকার উপযুক্ত হয় সেইভাবে তাদের গঠন করা, এবং দুই, ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাদের যথোচিত স্থান দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ‘প্যাটেল পরিকল্পনা’ নামে একটি তিন দফা একীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(১) ২১৬টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে ভৌগলিক দেিক থেকে তাদের সন্নিহিত প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী ওড়িশা প্রদেশের সঙ্গে ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের সংযুক্তি দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তি দিয়ে তা শেষ হয়।

(২) ৬১টি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবর্তিত করা হয়। একীকরণের এই রীতি কেবল সেইসব ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয় যেখানে প্রশাসনিক, সামরিক অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রের শাসন প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়।

(৩) কতগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যকে সম্মিলিত করে টিকে থাকতে পারে এমন নতুন কিছু একক গঠন করা হয়েছিল, যাকে বলা হত রাজ্যসঙ্ঘ। এইভাবে ২৭৫টি দেশীয় রাজ্যকে সম্মিতি করে ৫টি সঙ্ঘ গঠন করা হয়—মধ্যভারত, পাটিয়াটা ও পূর্ব পাঞ্জাব সঙ্ঘ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন।

মহীশূর, হায়দ্রাবাদ এবং জম্মু-কাশ্মীর ভারত সঙেঘর অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা বজায় রাখে। সমস্ত প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমর্পন করার পরিবর্তে বিশিষ্ট রাজ্যগুলির শাসকদের সমস্ত কর থেকে মুক্ত রাজভাতা প্রদান করা হয়। ১৯৪৯ সালে যার মূল্য ছিল ৪ কোটি ৬৬ লক্ষা টাকা। শাসকদের উত্তরাধিকারের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিছু ব্যক্তিগত অধিকার ও বিশেষ অধিকার তাঁদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

দেশীয় রাজাদের প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলিকে সমসাময়িক ও পরবর্তী পর্যবেক্ষকরা কঠোর সমালোচনা করেছেন। সরকারী নীতিকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেছেন যে, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের অব্যবহিত পরের কঠিন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, দ্রুত আঞ্চলিক ও রাজনৈকিক পুনর্গঠনের স্বার্থে এই বিশেষ সুবিধাগুলি ছিল নগন্য মূল্য যার বিনিময়ে দেশীয় রাজাদের স্বাধীন অস্তিত্বের বিলোপসাধন করা হয়েছিল। এর ফলে দেশভাগের ক্ষত কিয়দংশে প্রশমিত হয়েছিল।

২.৭ সংহতির পথে ভারত ঃ পণ্ডিচেরী ও গোয়া

ভারতের ভূপৃষ্ঠে আরো দুটি সমস্যাকণ্টকিত স্থান থেকে গেল ঃ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ফরাসি ও পর্তুগীজ উপনিবেশ যার মূল ঘাঁটি ছিল পণ্ডিচেরী ও গোয়া। এই উপনিসেবশগুলির জনসাধারণ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগদান করতে তৎপর ছিল। ফরাসি কর্তৃপক্ষ পরিণত বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৫৪ সালে পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য ফরাসি ঘাঁটি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ন্যাটো (NATO) গোষ্ঠীর মিত্র ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট হয়ে পর্তুগীজরা গোয়া ধরে রাখতে দৃশ প্রতিজ্ঞ ছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে নেহরু ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬১ গোয়াতে ভারতীয়

সেনা পাঠান। গোয়ার শাসক কোন প্রকার সংঘর্ষে না গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধীনতার চোদ্দ বছর পর ভারতের আঞ্চলিক সংহতি সম্পূর্ণ হয়।

স্বাধীন ভারতের আঞ্চলিক পুর্গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সহজেই চোখে পড়ে তা হল ভারতবর্ষের আঞ্চলকি সীমানা প্রকৃতিদত্ত বা ইতিহাসলব্ধ নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশেষ পরিস্থিতি, পদ্ধতি এবং ভারত সরকারের সাথে দেশীয় রাজাদের আপোষ আলোচনার ফলশ্রুতি এই সীমারেখাগুলি।

২.৮ সংহতির পথে ভারত ঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি

স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকের মধ্যে ভাষা বিভিন্নরূপে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির অব্যবহিত পরেই ভারতীয় সংহতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি। ১৯৫০ সালে যখন সংবিধান কার্যকরী করা হয় তখন স্বাধীন ভারতের অঞ্চলসমূহ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল—ভাগ ‘ক’-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন প্রদেশসমূহ যথা, অসম, বিহার, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বতন রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ‘খ’ ভাগের রাজ্যগুলি গঠিত হয়েছিল। যথা—হাদাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য সংঘ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। ‘গ’ ভাগের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি পূর্বতন মুখ্য মহাধ্যক্ষের (Chief Commissioner) প্রদেশসমূহ নতুবা রাজ্যশাসিত রাজ্যগুলির সংযুক্তির ফলে গঠিত ক্ষুদ্রতর একক। যথা—আজমীর, বিলাসপুর, ভূপাল কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মনিপুর, ত্রিপুরা, বিন্ধ্যপ্রদেশ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ‘ঘ’ বিভাগের রাজ্যগুলি। এই বিশেষ কাঠামো কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি, বরং একে একে রাজ্যগুলি ভারতে মিলে যাওয়ার ফলস্বরূপ গঠিত হয়েছিল।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের দাবির স্বপক্ষে কিছু জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। যে কোন দেশের সংস্কৃতি ও দেশাচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ভাষা। তাছাড়া শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও গণ-সাক্ষরতা সম্ভব। সাধারণ মানুষের কাছে গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে যখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিচালিত হয়। কিন্তু একটি বিশেষ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত না হলে সেই ভাষা কখনোই প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় কাজের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। এই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে ১৯১৯ সালের পর থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাতৃভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করে এবং ১৯২১ সালে তার সংবিধান পরিবর্তন করে আঞ্চলিক

শাখাগুলি ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে। গান্ধীজিও মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আঞ্চলিক ভাষাগুলির পূর্ণবিকাশের জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেহগুলির পুর্নগঠন একান্ত জরুরী। সুতরাং স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তররীণ সীমানাগুলি যে ভাষার ভিত্তিতে রচিত হবে এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিলঙ্গ কিন্তু দেশ বিভাগের হাত ধরে আসে গুরুতর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়য়ে রাষ্ট্রনেতাদের সামনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল জাতীয় সংহতি রক্ষা করা। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে ঐ ক্রান্তিকালে অভ্যন্তরীণ সীমারেখা পুনর্বিবেচনা করতে গেলে প্রশাসন ভেঙে পড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আঞ্চলিক ও ভাষাগত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং নাশকতামূলক শক্তিগুলি জাতীয় সংহতির কণ্ঠরোধ করবে। সুতরাং নীতিগতভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও ক্ষমতাসীন নেতারা বিষয়টিকে অগ্রবর্তীতা দিতে পারেননি।

যাই হোক,সংবিধান পরিষদে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় ১৯৪৮ সালে বিচারপতি এস. কে. দরের সভাপতিত্বে Linguintic Provincec Commission গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুর্গঠন প্রশাসনিক দক্ষতার অবক্ষয় ঘটাবে। একটি বিক্ষুব্ধ ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করবে এবং জাতীয় ঐক্য এমন একটি মুহূর্তে বিনষ্ট করবে যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা ধরে রাখা একান্ত জরুরী। এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে কমিশন রায় দেয় যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠন জাতীয় স্বার্তের পরিপন্থী, সুতরাং অবাঞ্ছিত। কিন্তু অর্ধশতাব্দী ধরে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ঘিরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি উচ্চাশা গড়ে উঠেছিল তা সহজে ধূলিসাৎ করা সম্ভব ছিল না। সাময়িকভাবে থিতিয়ে গেলেও এই দাবি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবিকে অবদমিত করলে জাতীয় ঐক্য অনেক বেশী মাত্রায় বিপন্ন হবে। এই দাবিতে দক্ষিণীরা ছিলেন অনড়। মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তেলেগু ভাষীরা অন্ধ্রে পৃথক তেলেগু রাজ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন; কন্নড় ভাষীরা প্রধানত মহীশূরে সন্নিবিষ্ট ছিলেন কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও সংখ্যালঘু হিসাবে উপস্থিত ছিলেন; মারাঠী ভাষীরা গুজরাতিদের সঙ্গে বোম্বাই ভাগাভাগি করে নেওয়ার পরিবর্তে নিজস্ব পৃথক রাজ্য দাবি করেছিলেন। মালয়লম ও তামিল ভাষীরাও একই কারণে বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং অনুরূপ আকাঙ্খা কোষণ করতেন। অংশত জনমতের চাপে এবং অংশত বিষয়টি রাজনৈতিক মাত্রাপ্রাপ্ত হচ্ছে দেখে জহওরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং পট্টভি সিতারামাইয়াকে নিয়ে জে. ভি. পি. কমিটি গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৪৮) ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য। জেভিপি কমিটির প্রতিবেদনেও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়। পরিনামস্বরূপ দেশ জুড়ে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে গণ-আন্দোলনের জোয়ার আসে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অন্ধর রাজ্যের দাবিতে তেলেগু ভাষীদের সংগ্রাম। অর্ধশদাব্দী ধরে এই দাবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই সহানুভূতি লাভ করেছিল। জেভিপি কমিটি মদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে অন্ধ্র গঠন করার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয় এবং তামিলনাড়ুর নেতৃবৃন্দও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু বিতর্ক দেখা দেয় মাদ্রাজ শহরকে কেন্দ্র করে। অন্ধ্র নেতারা মাদ্রাজ ড়ে দিতে ইচ্ছক ছিলেন না। কিন্তু ভৌগলিক ও ভাষাগত দিক থেকে মাদ্রাজ তামিলনাড়ুর প্রাপ্য ছিল। ১৯শে অক্টোবর ১৯৫২ জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী পোট্টি শ্রীরামালু আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন পর তাঁর মৃত্যু হলে অন্ধ্রজুড়ে শুরু হয় দাঙ্গা, মিছিল, হরতাল ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ। এই পরিস্থিতিতে অবশেষ সরকার অন্ধ্র রাজ্যের দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৩ সালো অক্টোবরে সৃষ্ঠ হয় তেলেগুভাষী অন্ধ্র ও তামিল ভাষী অঞ্চল তামিলনাড়ু।

অন্ধ্রের সাফল্য ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুনর্গঠনের দাবিতে আন্দোলনরত অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীকে উৎসোহিত করে। ঐ সময় নেহরু আঞ্চলিক পুনর্গঠনের নীতি সম্পূর্ণ কার্যকরী করার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তাঁর পক্ষে ধারাবাহিকভাবে জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিয়দংশ জনগণের জচাহিদা পুরণ করতে এবং কিয়দংশে সমস্যাটিকে প্রলম্বিত করতে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে নেহরু বিচারপরি ফজল আলি, কে. এম. পানিক্কর ও হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে নিয়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন রাজ্য পুনর্গঠনের সমগ্র বিষয়টি "নিরপেক্ষ ও নিরাসক্তভাবে" পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে। ১৯৫৫ সালে এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। কমিশনের রায় অবশ্য বোম্বে ও পাঞ্জাব বিভাজনের বিপক্ষে ছিল। কিঞ্চিৎ রদবদল করে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন সংসদে পাশ করাহয়। এর ফলে চোদ্দটি রাজ্য ও ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চল অন্ধ্র রাজ্যকে হস্তান্তরিত করাহয়। পুরাতন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মালাবার জেলার সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর কোচিতনকে যুক্ত করে কেরলের সৃষ্টি হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও রাজ্য পুনর্গঠন আইনের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মারাঠাভাষীরা। এই কমিশনের প্রতিবেদন মালয়লম ও কন্নড়ভাষীদের চাহিদাপূরণের সুপারিশ করলেও বোম্বে বিভাজনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। বরং বোম্বে ও মধ্যপ্রদেশের অংশ বিশেষ নিয়ে বিদর্ভ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাব কিছু মারাঠাভাষীকে নিজস্ব রাজ প্রদান করত ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ মারাঠাভাষীই অবিভক্ত বোম্বে রাজ্যে গুজরাতীদের তুলনায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হত। এই আপোষ মীমাংসার ফলে বোম্বে শহরে দাঙ্গা বেধে যায় এবং ৮০ জনের প্রাণহানি হয়। সমস্যা সমাধানের শেষ প্রয়াসে রাজ্য পুনর্গঠন আইন কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদের মারাঠাভাষী এলাকাগুলি বোম্বের সাথে সংযুক্ত করে ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে।

এই পদক্ষেপ কিন্তু কোন পক্ষকেই তুষ্ট করতে পারল না। মারাটাভাষীরা বোম্বে শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথক রাজ্যের দাবিতে অনড় থাকে। অপরদিকে অবিভক্ত নতুন রাজ্যে গুজরাতীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। অধিকন্তু সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি ও মহাগুজরাত জনতা পরিষদ নামক দুটি ভাষাভিত্তিক গংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির স্থাভিষিক্ত হয়। গণ-আন্দোলন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের চাপে অবশেষে ১৯৬০ সালের মে মাসে নেহরু সরকার বোম্বে রাজ্যকে বিভাজিত করে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত নামক দুটি পৃথক রাজ্য সৃষ্টি করে। বোম্বে শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমেদাবাদ হয় গুজরাতের রাজধানী।

পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাষা সংক্রান্ত নীতি লঙঘন করা হয়। ১৯৫৬ সালে পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য সমূহের সঙ্গে পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করা হয়। পাঞ্জাবী, পাহাড়ী ও হিন্দিভাষী নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব হয়ে যায় একটি ত্রিভাষী রাজ্য। এই রাজ্যের পাঞ্জাবীভাষী এলাকায় পৃথক পাঞ্জাবী সুবার দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টি সাম্প্রদায়িক আকার প্রাপ্ত হয়। অকালী দলের নেতৃত্বে শিখ এবং জনসঙ্ঘের নেতৃত্বে হিন্দু সাম্প্রদায়কি গোষ্ঠী রাজনীতির হাতিরয়ার হিসাবে ভাষাকে ব্যবহার করে। একদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা পাঞ্জাবী মাতৃভাষা হিসাবে মেনে নিতে অসম্মত হয়ে পাঞ্জাবী সুবার দাবির বিরোধিতা করে, অপরদিকে গুরুমুখী হরফে লিখিত পাঞ্জাবীকে শিখ ভাষা বলে প্রচার করে শিখ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পৃথক শিখ রাজ্যের দাবি তোলে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের একাংশ এই দাবি সমর্থন করে। কিন্তু নেহরু ও পাঞ্জাব কংগ্রেসের অধিকাংশ এই মত পোষণ করতেন যে প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব রাজ্যের দাবি আদি ভাষার আবরণে সজ্জিত একটি সাম্প্রদায়িক দাবি। নীতিগত কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের বিরোধী চিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনও পৃথক পাঞ্জবী রাজ্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ তা বাষা অথবা সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যারই সমাদান করবে না।

দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত ও সংগ্রামের পর অবশেষে বাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন বাস্তবে পরিণত হল। নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই পুনর্গঠন প্রমান করে যে ভাষার প্রতি আনুগত্য জাতির প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে হুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, পরিপূরকও বটে। বাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করে। ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন সাধন করে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এমন একটি ক্ষোভের উপশম করেন যা পরবর্তীকালে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছন্নতাবাদী প্রবণতার জন্ম দিত। আবার, ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন কোনভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাকোর পরিপন্থী ড়হয়নি বা কেন্দ্রকে দুর্বল অথবা নিষ্ক্রিয় করেনি। রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন পুনর্বিন্যাস দেশের ঐক্যকে ব্যাহত না করে তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। রজনী কোঠারীর মতে বাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুনর্গঠন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রকে যুক্তিসঙ্গত করেছিল, এবং ভাষা সমন্বয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অসাধারণ কার্যকুশল বলে বিবেচিত হয়েছিল। এর ফলে গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটে এবং গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের আদর্শ এবং তাকে সমর্থন করার জন্য সমরূপ বা বিমিশ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংঘাত থেকে কতকগুলি নিয়মাবলী ও রাজনৈতিক কৌশলের উদ্ভব হয় যেগুলি সমাকলনবাদী ও আত্তীকরণবাদী আদর্শের তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি বহুত্ববাদী। কার্যত নেহরুর যুগে ভারতীয় রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল। প্রথম, বলা হয়েছিল যে নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেবে না, বরং সর্বশক্তি নিয়োগ করে, প্রয়োজনে সামরিক বল প্রয়োগ করে, এ ধরনের আন্দোলন দমন করবে। দ্বিতীয়, সরকার ধর্মের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের কোন দাবি বিবেচনা করবে না। তৃতীয়, খামখেয়ালীভাবে অথবা একটি বিশেষ অঞ্চলে কথিত কোন বিশিষ্ট ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি গ্রাহ্য হবে না। বিদ্যমান রাজ্যগুলিকে বিভাজিত করার অনীহা থেকেই এই নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। চতুর্থ, রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি যদি সংশ্লিষ্ট ভাষা গোষ্ঠীগুলির যে কোন একটি গোষ্ঠীর দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি বিবেচনাযোগ্য মনে করবে না।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন ভাষাগত সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি করে। একভাষী রাজ্যের অস্তিত্ব কোনমতেই বাস্তবোচিত ছিল না। পরিণামস্বরূপ ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত রাজ্যগুলিতে বহু সংখ্যক ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যায়। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ১৮% যে রাজ্যে বসবাস করে সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা তাদের মাতৃভাষা থেকে ভিন্ন। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নটি গোড়া থেকেই গুরুত্ব সহকারে বিচার্য বিষয় ছিল। একদিকে, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সম্ভাবনা সদা বর্তমান ছিল, অপরদিকে রাজ্যের প্রধান ভাষার সঙ্গে তাদের সংহতি সাধনেরও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করার যে তারা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার হবে না এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও বিকাশ অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সংখ্যাগুরুদের আশ্বস্ত করতে হত যে সংখ্যালঘু চাহিদার প্রতি সহানুভূতি তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমার্থক নয়। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ ও ৩৪৭। অনুচ্ছেদ ৩০ অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কোন বৈষম্য করবে না। মৌলিক অধিকার ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার্থে সংসদীয় আইন দ্বারা দুটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরো দু'জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ। পণ্ডিত নেহরুর চিন্তা অনুযায়ী এই পরিষদগুলির উদ্দেশ্য "সহযোগিতামূলক কর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা"। যদি ঠিকমতো কাজ করে তাহলে এই পরিষদগুলি ভাষা

আর প্রদেশের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। অধিকাংশ পরিষদের কৃতিত্বই ছিল নগন্য কিন্তু দক্ষিণ আঞ্চলিক পরিষদ প্রদিবেশী রাজ্য সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের মিলনস্থল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন বিশেষ অঅইকারিক নিযুক্ত করেন। সেই বিশেষ আধিকারিক সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য যেসব রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে সেইসবরক্ষাকবচ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অনুসন্ধার করে দেখবেন। কমিশন প্রতটি রাজ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন জমা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন, এবং সেই সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দেবেন। রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হবে সংসদের প্রত্যেক কক্ষে রিপোর্ট পেশ করা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো। এই দুটি পদক্ষেপ নতুন রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সম্ভবনা যথাসম্ভব নিমূল করেছিল। এই সমস্ত পদক্ষেপ সত্তেবও বলা যয় যে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি সর্বদা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেনি।

২.৯ সংহতির পথে ভারত ঃ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংকট

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে স্বাধীন ভারতের প্রথম কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় সর্বাধিক বিভেদ সৃষ্টিকারী উপাদান ছিল ভাষা। ভাষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের দাবি কিভাবে জাতীয় ঐক্য বিপন্ন করেছিল, সেই ইতিহাস আমরা আগের অংশে পাঠ করেছি। তার পাশাপাশি আমরা এও দেখেছি যে প্রধান ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন এক শ্রেীর ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৃস্টি করে যারা প্রায়শই বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। এই অংশে আমরা দেখব সরকারী ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশের সংহতি কিভাবে বিপন্ন হয় এবং রাষ্ট্র নেতারা গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কিভাবে সযত্নে সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে সমাধানের দিকে অগ্রসর হয়।

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ ভাষা। সব সমাজে, বিশেষত ভারতবর্ষের মত বহুভাষী সমাজে ভাষাগত পরিচয় যথেষ্ট অর্থবহ। শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, চাকরী, বৃত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাষার সং সম্পর্কিত এবং ভাষাগত বিভিন্নতা এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে জটিল রাজনৈতিক আর্বতের সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারত অসংখ্য ভাষাকে একটি ভাষার দ্বারা স্বাঙ্গীকরণ করার নীতি গ্রহণ করেনি, বরং এই বহুমুখীতাকে মেনে নিয়েছিল যাতে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে বা তা দীর্গস্থায়ী না হয়। এ সত্তেও সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজির জায়গায় হিন্দির প্রচলন সমস্যা সৃষ্টি করে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের উদারগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচিতর জন্য জাতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা আগেই অস্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সংবিধান চোদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু

সরকারী কার্যকলাপ এতগুলি ভাষায় পরিচালিত হওয়া সম্ভব ছিল না, অতএব প্রয়োজন দেখা দেয় একটি সাধারণ বাষার যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হবে, সাধারণ রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের এবং রাজ্যগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত হবে। এখন প্রশ্ন দেখা দিল কোন ভাষাকে সর্বভারতীয় যোগাযোগের মাধ্য হিসাবে ব্যবহার করাহবে। ইংরাজি এবং হিন্দি, এই দুটি ভাষাই কেবল এই স্তরে ব্যবহৃত হওয়ার দাবি করতে পারত। ইংরাজি ভাষার মর্যাদা এবং ভারতের সরকারী ও অন্যান্য কাজে এর সম্ভাব্য ব্যবহারের একটি বাস্তব ও একটি আবেগজনিত দিক ছিল। বাস্তব প্রশ্নগুলি চিল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের যেকানে ইংরাজি ছিল সব থেকে প্রভাবশালী ভাষা। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞা ও প্রযুক্তির ভাষা হিসাবে হিন্দি তখনও যথেষ্ট অনুন্নত ছিল শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে এবং অনূদিত পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতার দিক থেকে।

এই বাস্তব সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য অন্তত ইংরাজি ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা ছিল এই যে ইংরাজি ভাষা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ জন-সংখ্যার এক শতাংশের বোধগম্য ভাষা। অতএব এই বাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিলে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হবে যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। পাশাপাশি আবেগজনিত বক্তব্য ছিল এই যে একটি দেশ যথার্তই স্বাধীন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার জনসাধারণ, দেশের সীমানার ভিতর অন্তত, বিদেশী ভাষা বর্জন করে দেশীয় ভাষা গ্রহণ না করছে।

হিন্দি ভাষার প্রবক্তারা হিন্দির সমর্থনে জোরাল যুক্তি উপস্থাপন করেন। হিন্দি দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশের না হলেও বৃহত্তম অংশের, অর্থাৎ 42%-এর কথিত ভাষা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়, বিশেষ করে গণ-আন্দোলনের যুগে হিন্দি ও হিন্দুস্তানী ভাষা সর্বভারতীয় ভাষার ভূমিকা পালন করেচিল। হিন্দিভাষা কথিত হয় না এমন অঞ্চলেও হিন্দি সর্বাধিক কথিত ও বোধগম্য ভাষা হিসাবে গ্রহযোগ্য হয়েছিল। হিন্দি ভাষার অত্যুৎসাহী সমর্থকদের মধ্যে চিলেন তিলক, গান্ধী, সি রাজাগোপালাচারী, সুবাষ গোস এবং সর্দার প্যাটেল। সংবিধান পরিষদে দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতক দেখা দেয়—(১) ইংরাজি ভাষার স্থান গ্রহণ করবে হিন্দি না হিন্দুস্থানী? (২) এই পরিবর্তনের সময়সীমা কি হবে?

সরকারী ভাষার বিষরটি শুরু থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গান্ধী ও নেহরু চেয়েছিলেন দেবনাগরী বা উর্দু হরফে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা স্বাধীন ভারতে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে। হিন্দি ভাষার সমর্থকরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বক্তব্য মেনে নেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাজন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে পাকিস্তানপন্থীরা মুসলমান ও পাকিস্তানের ভাষা হিসাবে উর্দুকে তুলে ধরলে, হিন্দির অনুগামীরাও বিশেষ উৎসাহিত হন। উর্দুভাষাকে তাঁরা বিচ্ছিন্নতার প্রতীক বলে বর্ণনা করে দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি জানান। এই প্রশ্নে কংগ্রেস দলেও বিভাজন দেখা

দেয়। অবশেষে নেহরু ও আজাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেস সংবিধানিক দল হিন্দি ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। হিন্দি গোষ্ঠীকেও আপোষ করতে হয়, স্থির হয় যে হিন্দি হবে স্বাধীন ভারতের সরকারি ভাষা, জাতীয় ভাষা নয়।

ইংরাজি থেকে হিন্দিভাষায় পরিবর্তনের সময়সীমার প্রশ্নটি হিন্দি ও অ-হিন্দি অঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করে। হিন্দির প্রবক্তারা অবিলম্বে পরিবর্তন চেয়েছিলেন কিন্তু অ-হিন্দি ভাষীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য না হলেও দীর্ঘ সময়ের জন্য ইংরাজি ভাষাকে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু চেয়েছিলেন হিন্দিভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে কিন্তু পাশাপাশি ইংরাজিকে একটি অতিরিক্ত সরকারি ভাষারূপে বহাল রাখতে। এর ফলে হিন্দিতে পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে সাধিত হবে এবং ইংরাজি ভাষা চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হবে।

অ-হিন্দিভাষী ভারতীয়দের আশঙ্কার প্রকৃত কারণ ছিল এই যে হিন্দি সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হলে, অ-হিন্দি এলাকা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত, শিক্ষা, সরকারি চাকরী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এঁরা আরো বলেন যে অ-হিন্দি এলাকার ওপর হিন্দি ভাষা আরোপ করার অর্থ হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য।

সংবিধান প্রণেতারা সচেতন ছিলেন যে একটি বহুভাষী রাষ্ট্রের নেতা হিসাবে তাঁরা কোন ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের স্বার্থকেই অবজ্ঞা করতে পারেন না। ফলে একটি আপোষ মীমাংসায় আসা হল---সংবিধান অনুযায়ী দেবনাগরী হরফে লিখিত ও আন্তর্জাতিক সংখ্যাসহ হিন্দিকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল। পাশাপাশি এও বলা হল যে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজীও সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং তারপরও বিশেষ বিশেষ কারণে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার হবে কিনা তা সংসদকে বিধি প্রণয়ন করে স্থির করতে বলা হয়। হিন্দিভাষার উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সরকারের ওপর এবং যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য সংবিধান একটি কমিশন গঠনের এবং একটি সংসদীয় যুগ্ম কমিটি নিয়োগের নির্দেশ দেয়। রাজ্যস্তরে সরকারী ভাষা নির্ধারণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিধানমণ্ডলীর ওপর ন্যস্ত করা হল কিন্তু কেন্দ্রের সরকারি ভাষাই একটি রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যোগসূত্রকারী ভাষা হবে।

সংবিধান প্রণেতারা আশা করেছিলেন যে ১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দি ভাষার প্রবক্তারা হিন্দি ভাষার দুর্বলতা অতিক্রম করবেন এবং অ হিন্দি এলাকাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি এই প্রত্যাশাও ছিল যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষারও প্রসার ঘটবে এবং হিন্দির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হতে হতে এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষার প্রসার এত মন্থর গতিতে হয়েছিল যে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়নি। উপরন্তু সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দির সাফল্যের সব থেকে বড় অন্তরায় ছিলেন হিন্দিভাষার প্রবক্তরা। ধীরে, ক্রমান্বয়ে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অ-হিন্দি এলাকায় হিন্দিকে গ্রহণযোগ্য করে

তোলার পরিবর্তে উগ্র হিন্দিবাদীরা সরকারি সক্রিয়তার মাধ্যমে হিন্দি ভাষা আরোপ করার নীতি অবলম্বন করেন। এর ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক, সমাজ বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাষা হিসাবে হিন্দি যথেষ্ট উন্নত ছিল না ; সেই ভাষাকে উচ্চশিক্ষা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়ে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে পরিশীলিত না করে হিন্দিভাষী নেতৃবৃন্দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারি ভাষার মর্যাদা। আবার সহজ, বোধগম্য ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গড়ে না তুলে এই গোষ্ঠী হিন্দি ভাষার সংস্কৃতায়নে প্রয়াসী হয়, ফলে, আরো বেশি মাত্রায় হিন্দি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে সরকারি ভাষাকে কেন্দ্র করে তীব্র মত পার্থক্য আবার একবার প্রকাশ্যে আসে এবং তিক্ত বিভাজনের সৃষ্টি করে। ১৯৫৫ সালে বি. জি খেরের সভাপতিত্বে প্রথম সরকারি কমিশন নিয়োজিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন জমা দেয় ; এই প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে একটি সংযুক্ত সংসদীয় কমিটি। এই কমিটি সুপারিশ করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপে হিন্দি ভাষা ইংরাজির স্থান গ্রহণ করবে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থান্তর ঘটবে, মসৃণভাবে এবং যতদূর সম্ভব কম অসুবিধা সৃষ্টি করে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজিই প্রধান সরকারি ভাষা থাকবে, হিন্দি সহকারি সরকারি ভাষা হিসাবে কাজ করবে। ১৯৬৫ সালের পর যখন হিন্দি কেন্দ্রের প্রধান সরকারি ভাষার স্থান গ্রহণ করবে, তখন ইংরাজি সহকারি সরকারি ভাষা হিসাবে চলতে থাকবে। কেন্দ্রের কোন কাজে ইংরাজির ব্যবহারের উপর আপাতত কোন প্রকার নিষেধ আরোপ করা হবে না এবং ১৯৬৫-র পরও সংসদ বিধিদ্বারা যে সব কাজে ইংরাজির ব্যবহার অনুমোদন করবে সেই সব কাজে যতদিন প্রয়োজন ততদিন ইংরাজির ব্যবহার থাকবে, তবে কিছুকাল পর বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দিকে স্বীকার করা হবে, যাতে প্রার্থীরা তাদের পছন্দমতো ইংরাজি বা হিন্দি যে কোন ভাষা বেছে নিতে পারে। রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ দ্বারা উপরোক্ত সুপারিশগুলি কার্যকরী করার নির্দেশ দেন। প্রধান নির্দেশ ছিল বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও বিবিধ ক্ষেত্রে হিন্দি পরিভাষা উদ্ভাবন এবং প্রশাসনিক ও কার্য-পরিচালনা বিষয়ক মুদ্রিত রচনাদির ইংরাজী থেকে হিন্দিতে অনুবাদ সম্পর্কে। পরিভাষা উদ্ভাবনের জন্য সরকারি ভাষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দুটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হয়েছিল—(১) সরকারি ভাষা (বিধানিক) কমিশন, (২) বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক পরিভাষা সম্পর্কিত কমিশন।

সরকারি ভাষা কমিশনে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর প্রতিনিধি, অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পি, সুব্বারোয়ান কমিশনের প্রতিবেদনের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে হিন্দির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন যে কমিশন হিন্দিভাষীদের স্বার্থ তুলে ধরেছে যারা

চিরতরে না হলেও, অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশেষ সুবিধা উপভোগ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দি প্রচারিনী সভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার দায়িত্বে ছিলেন। অনুরূপভাবে হিন্দি প্রচারিনী সভার দক্ষিণ শাখার প্রাক্তন সভাপতি সি. রাজাগোপালাচারি ঘোষণা করেন, "হিন্দি ভাষার প্রবক্তাদের কাছে ইংরাজি যতটা বিদেশী, অ-হিন্দি ভাষী মানুষের কাছে হিন্দি ততটাই বিজাতীয়।" দক্ষিণ ভারতে "হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের" ধ্বনি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে, হিন্দির প্রবক্তারা, যেমন, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ও শেঠ গোবিন্দদাস সংযুক্ত সংসদীয় কমিটির বিরুদ্ধে ইংরাজির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। হিন্দি ভাষী নেতৃবৃন্দের একাংশ পণ্ডিত নেহরু ও শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের কঠোর সমালোচনা করেন সাংবিধানিক বিধানগুলি কার্যকর করতে অযথা বিলম্ব করার জন্য। তাঁরা যথার্থই বুঝেছিলেন যে অবিলম্বে হিন্দিতে অবস্থান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করলে তবেই ১৯৬৫ সালের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হবে। ১৯৫৭ সালে ড. রামমনোহর লোহিয়ার সংযুক্ত সমাজবাদী দল এবং জনসঙ্ঘ ইংরাজী থেকে অবিলম্বে হিন্দিতে অবস্থান্তরের দাবিতে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথার্থই বুঝেছিলেন যে সরকারি ভাষার বিষয়টি ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর বিভাজনের সৃষ্টি করতে চলেছে। চূড়ান্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁরা অ-হিন্দি এলাকার ক্ষোভ বিবেচনা করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল একটি সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়া। স্পষ্ট ভাষায় নেহরু পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দেশের কোন অঞ্চলে সরকারি ভাষারূপে হিন্দি আরোপ করা যাবে না ও হবে না, এবং অ-হিন্দি ভাষী জনগণের ইচ্ছানুসারেই হিন্দিতে অবস্থান্তর সাধন করা হবে। এক্ষেত্রে নেহরু সমাজবাদী প্রজা পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন। ৭ই আগস্ট ১৯৫৯ সালে সংসদে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে নেহরু সুনির্দিষ্টরূপে আশ্বাস দেন, "যতদিন জনসাধারণের প্রয়োজন থাকবে ততদিন আমি ইংরাজিকে একটি বিকল্প ভাষারূপে বজায় রাখব, এবং আমি এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেব হিন্দি ভাষী জনগণের উপর নয়, অ হিন্দি ভাষী মানুষদের উপর।" দক্ষিণ ভারতীয়দের আশঙ্কা প্রশমিত করতে তিনি আরো বলেন যে তাদের পক্ষে হিন্দি শেখা কখনোই বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৬৩ সালে সরকারি ভাষা আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য, নেহরুর ভাষায়, ১৯৬৫ সালের পর ইংরাজি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ শিথিল করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় পূরণ হয়নি। আইন অনুসারে হিন্দির অতিরিক্ত ইংরাজি ভাষা ব্যবহৃত "হতে পারে"। "হবে" শব্দের পরিবর্তে "হতে পারে" ব্যবহার অ-হিন্দি গোষ্ঠীগুলির নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে তোলে। এই আইন তাদের চোখে বিধিবদ্ধ অঙ্গীকার বলে প্রতীয়মান হল না। তাঁরা চেয়েছিলেন লৌহ কঠিন প্রতিশ্রুতি, কারণ যদিও নেহরুর উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল, পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

২.১০ সংহতির পথে ভারত ঃ উপজাতীয় নীতি ও উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

ভারতীয় জনজীবনের মূলস্রোতে উপজাতীয় জনসমাজকে সংহত করার কাজমি অপেক্ষাকৃত জটিল। দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়গুলি এক পৃথক সংস্কৃতির অংশীদার। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সমগ্র জনসংখ্যার ৬.৯% হলেন উপজাতি জনসম্প্রদায়গুলি যাঁরা ন্যুনাধিক চার'শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর পূর্ব ভারত ব্যতীত অন্য সব রাজ্যেই তাঁরা জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ। পার্বত্য ও বনাঞ্চলে বাস করার ফলে ঔপনিবেশিক আমলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেছিলেন এবং অ-উপজাতীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারের পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়ঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসন একাধিক উপায়ে উপজাতীয় জনজীবনকে স্পশল করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে আদিবাসী এলাকাগুলিতে বেশ কিছু বহিরাগত মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই অনুপ্রবেশকারীরা ছিল মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজস্ব সংগ্রহকার, সরকারী কর্মচারী এবং অন্তবর্তী শ্রেণীর মানুষ যারা উপজাতি জনসমূহের হিরাচরিত জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছিল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সম্প্রদায়গুলকে শোষণ করেছিল। ঔপনিবেশকি শাসনর পরিণামস্বরূপ উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি জমির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মহাজনের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে, অন্তবর্তী শ্রেণীর মানুষের দ্বারা শোষিত হয়, বন এব বন্য সামগ্রীর ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকরসমূহও ক্রমে লোপ পায়।

উপজাতি জনসমূহের টপ্রতি স্বাধীন ভারতের অনুসৃত নীতির মূল প্রেণা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর নির্ধারিত নীতির র্মূল সূত্র ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। নেহরুর নিজের ভাষায়, "এখানে (উপজাতি অঞ্চলে) আমাদের সর্বপ্রথম যে সমস্যার মসম্মুখীন হতে হবে তা হল এদের (উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলিকে) আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন বোধ জাগানো, এবং এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটান যে তারা ভারতবর্ষের অংশ এবং এখানে তাদের অবস্থান সম্মানজনক।" একই সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা তাদের চোখে শুধু প্রতিরক্ষা বিধানের শক্তিস্বরূপই নয়, পরিত্রাতাও বটে। নেহরুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনায়াসেই উপজাতি জন জীবনের বিশিষ্টতার স্থান সঙ্কুলান হবে।

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে উপজাতিদের প্রতি দু'ধনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। একটি মতানুসারে আদিবাসী জগত বহির্ভুত আধুনিক প্রভাবের দ্বারা আদিবাসী জীবনকে কলুষিত না করে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখাই শ্রেয়। দ্বিতীয় মতটি আদিবাসীদের সম্পূর্ণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে স্বাঙ্গীকরণ করার পক্ষপাতী ছিল। আদিবাসী জীনযাত্রার ক্রমিক অবসান তাদের কাছে ছিল উন্নয়নের সমার্থক।

নেহরু দুটি সৃষ্টিকোণই বর্জন করেন। তাঁর মতে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির নিহিতার্থ ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীকে জাদুগরে সংরক্ষিত গবেষণঅ যোগ্য নমুনারূপে গণ্য করা। এক অর্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত অবমাননাকর। তাছাড়া উপজাতি জীবনে বহির্জগতের অনুপ্রবেশ এতদূর াগ্রসর অগ্রসর হয়েছে যে এই প্রক্রিয়াকে বিপরীত দিকে চালিত করা আর কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার ভারতীয় জনস্রোতের আদিবাসী জীবনকে গ্রাস করাও নেহরুর কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না কারণ তার পরিণামে আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বা ও সংস্কৃতি বজায় রেখে তাদের ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তাবর অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে। নেহরুর নীতির দু'টি স্থির সূচক ছিল উপজাতি জন সমাজের উনয়ন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে উন্নয়ন।

আপাতদৃষ্টিতে দু'টি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে নেহরু কতগুলি মূলনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম, কোন বহিরাগত প্রভাব বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, উপজাতি সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাবাবিক গুণাবলী অনুযায়ী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে। অ-উপজাতীয় মানুষরা নিজেদের আপেক্ষিক উৎকর্ষতার কোন গুঢ়েষা নিয়ে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করবে না। দ্বিতীয়, জমি ও বনজ সম্পদের প্রতি উপজাতি গোষ্ঠীর অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছিল যে বহিরাগতরা কোন জমি দখল করতে পারবে না। এছাড়া উপজাতি এলাকায় বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশও কঠোরভাবে নিয়ন্তণ করা হয়েছিল। তঁতীয়, উপজাতি ভাষাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া হয়। চতুর্থ, নীতিগতভাবে, উপজাতি অঞ্চলের প্রশাসনরে দায়িত্ব এই সম্প্রদায়ের মানুষের ওপরেই ন্যস্ত হবে, বহিরাগতরা অত্যন্ত কম সংখ্যায় এই কাজে নিযুক্ত হবেন। যথেষ্ট সংবেদনশীল ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। পঞ্চম, উপজাতি এলাকাগুলির প্রশাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন না করাই বাঞ্ছনীয়, বরং লক্ষ্য হবে উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাসমূহের মাধ্যমেই তাদের উন্নয়ন সাধন করা।

সরকারি নীতি রূপায়িত কারার প্রথম পদক্ষেপ ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬। এই অনুচ্ছেদে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র বিশেষ যত্নসহকারে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর, বিশেষ করে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করবে এবং সামাজিক অন্যায় ও সমস্ত রকম শোঐণ থেকে তাদের রক্ষা করবে। যে সব রাজ্য উপজাতি ক্ষেত্র আছে সে সব রাজ্যের রাজ্যপালদের উপজাতি জনসমাজের স্বার্থরক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যপাল নির্দেশ দিতে পারেন যে সংসদের বা রাজ্য বিধানমরডলের কোন বিশেষ অওইন রাজ্যর কোন তফসিলী ক্ষেত্রে বা তার কোন ভাগে প্রযুক্ত হবে না, অথবা তিনি ঐ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন। একটি রাজ্যের তফসিলী ক্ষেত্রের শান্তি ও সুশাসনের জন্য রাজ্যপাল প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন যা (১) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের দ্বারা বা

সদস্যদের মধ্যে ভূমির হস্তান্তর প্রতিষিদ্ধ বা সঙ্কুচিত করতে পারে, (২) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের ভূমি আবন্টন প্রতিনিয়ন্ত্রিত করতে পারে, (৩) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের সঙ্গে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সংশোধন করা হয়েছিল। বিধানমণ্ডলী ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতি তফসিলী জাতিও জনজাতিসমূহের সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সংবিধানে আছে। যে সব রাজ্যে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ আছে, সেইসব রাজ্যে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে একটি জনজাতি মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি এবং পরিষদের কর্তব্য হবে সংবিধান অনুযায়ী তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য বিহিত রক্ষাকবচগুলির সম্বন্ধে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং রাষ্ট্রপতি যেরকম নির্দেশ দেবেন সেরকম সময় অন্তর ঐ রক্ষাকবচগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট দেওয়া।

সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপজাতি জনসমাজের প্রগতি ও উন্নয়নের চিত্রটি বাস্তবে অতিশয় হতাশাব্যঞ্জক। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়া অন্য সর্বত্র উপজাতি সম্প্রদায়গুলি আজও দারিদ্র ও ঋণের শিকার, ভূমিহীন এবং প্রায়শই কর্মহীন। কারণ, সদিচ্ছাপ্রণোদিত পরিকল্পনাগুলির দুর্বল রূপায়ণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতিগুলির মধ্যে প্রায়শই বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। আবার তফসিলী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ তহবিল কখনো সদ্ব্যবহারের অভাবে পড়ে থাকে, কখনো বা অর্থ ব্যয় করে অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, আবার অনেক সময় তহবিল তছরূপও হয়। উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ প্রত্যাশিত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেনি। তফসিলী জনজাতি এলাকায় নিযুক্ত প্রশাসনিক ভারপ্রাপ্ত কর্বচারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অর্ধপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অথবা উপজাতি সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট।

আইন ও আইনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি প্রায়শই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। বহিরাগতদের হাতে জমির হস্তান্তর রোধ করার সঙ্কল্পে আইনগুলি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে উপজাতি সমাজের মানুষরা ক্রমবর্ধমান হারে জমির উপর অধিকার হারাতে থাকে। অনেক এলাকায় খনি ও শিল্পের দ্রুত প্রসার এদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারি ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে জঙ্গলের ঠিকাদারদের অশুভ আঁতাতের ফলে অরণ্য সংহার অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্য দিকে বন ও বনসম্পদের উপর উপজাতি সম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্যগত অধিকার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে। বন সংক্রান্ত আইন ও প্রতিয়িনমগুলিও বন দপ্তরের সহানুভূতিহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীরা উপজাতি জনগোষ্ঠীকে য়েরান ও শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। উপজাতি জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও নৈরাশ্যজনক।

উপরে পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে উপজাতি জনসমাজকে ভারতীয় রাজলনতিক ও সামাজিক জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার যে নীতিসমূহ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অবলম্বন করেছিলেন তা নিংসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এক কথায় এই নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে উপজাতি জনজাতিগুলির চিরাচরিত অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ সংবিধানের বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, উপজাতি জন সম্প্রদায়ের সত্ত্বা ও সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ মযাদা জ্ঞাপন করে তাদের শিক্ষার পাদপ্রদীপে নিয়ে আসা ও তাদের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত নীতি অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং বাতবিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের উপজাতি সংক্রান্ত নীতি ঔপনিবেশিক নীতিরই নয়া সংস্করণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যস্তরে সরকারি উদাসীনতা , দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের অসংবেদনশীলতা ও দুর্নীতি, এদের একাংশের সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও ঠিকাদারদের অশুভ আঁতা উপজাতিদের বিরাচরিত অধিকার সংরক্ষণ করারপরিবর্তে তা আরো সঙ্কুচিত করেছে। পরিণামও হয়েছে ভয়াবহ। অনগ্রসরতা, বঞ্চনা থেকে জন্ম নিয়েছে হতাশা, ক্রমবধমান অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আকার ধারণ করেছে। পরিতাপের বিষয় এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে স্বাধীন ভারতের শাসকবৃন্দ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষোভের প্রতিকার না করে, ঔপনিবেশিক শাসকদের াদলেই নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় নিয়েছে। ফলে আন্দোলনগুলি দমন করা সম্ভব হয়েছে এবং ভৌগলিক দিক থেকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ভারতীয় রাজ্য সংঘের অংশ হিসাবে টিকে আছে। কিন্তু নেহরুর নীতির মূলভাব পরাস্ত হয়েছে—উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠী ঃ

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অসমের পার্বত্য এলাকায় প্রায় শতাধিক উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাস। এরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক দুর্দশার শরিক হলেও এই অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টতা ছিল। প্রথম, এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিসমূহ জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। দ্বিতীয়, ইংরেজ শাসনকালে এই এলাকার সঙ্গে অ-উপজাতি এলাকার অর্থনৈতিক সংস্রব ঘটলেও, বহিরাগতরা এই অঞ্চলে খুব বেশি মাত্রায় অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তৃতীয়, এই অঞ্চলসমূহ অসম প্রদেশের অংশ হলেও তাদের পৃথক প্রশাসনিক মর্যাদা ছিল। এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করা হয়নি। উপজাতি সমাজ বহির্ভূত সমতলবাসীদের কৌম জমি করায়ত্ত করা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। পাশাপাশি ইংরেজ সরকার এই এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। মিশনারীরা যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করেন, তেমনই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক আকারে ধর্মান্তর সাধন করেছিলেন। মিশনারী কার্যকলাপ একাধারে উপজাতিদের আধুনিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত করেছিল, জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে তাদের

মুক্ত রাখতে সহায়তা করেছিল এবং অসম ও অবশিষ্ট ভারতের জনজীবন থেকে এদের বিচ্ছিন্নতায় উৎসাহ দিয়েছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কিছু মিশনারী ও অন্যান্য বিদেশী কর্মকর্তারা উত্তর পূর্ব ভারতে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেরণা দিয়েছিল।

উত্তর পূর্ব ভারতের উপজাতি জনসমাজের অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে নেহরু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "......তারা কোনদিনই ভারতবর্ষ নামক একটি দেশে বসবাস করার অনুভূতি ভোগ করেনি। বহিরাগতদের সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ইংরেজ প্রশাসক ও খ্রিস্টান মিশনারীদের যারা তাদের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাবের জন্ম দিয়েছিলেন।" সুতরাং নেহরু সরকারের উপজাতি সংক্রান্ত নীতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে অধিকতর মাত্রায় প্রাসঙ্গিক ছিল। এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে যা শুধুমাত্র অসমের উপজাতি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের উপজাতি অঞ্চলগুলি শাসিত হবে স্বশাসিত জেলা হিসাবে। এই স্বশাসিত জেলাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাহিক প্রাধিকারের বাইরে নয়, কিন্তু কতকগুলি বিধানিক ও বিচারিক কর্মসম্পাদনের জন্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিষদগুলি মূখ্যত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। তাদের কতকগুলি বিশেষক্ষেত্রে বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা আছে। যেমন—সংরক্ষিত বন ছাড়া অন্যান্য বন পরিচালন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও সামাজিক প্রথা। রাজ্যপাল এই পরিষদগুলিকে কোনো কোনো মামলা বা অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাও অর্পন করতে পারেন। এই পরিষদগুলির ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করার এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট কর ধার্য করার ক্ষমতাও আছে। তবে এই পরিষদগুলি কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি রাজ্যপালের সম্মতি না পেলে কার্যকর হবে না। এই তফসিলের উদ্দেশ্য ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলিকে নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবনধারণ করতে সহায়তা করা। উপজাতি জনসমূহকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার অভিপ্রায়ে ভারত সরকার সংবিধানের অধিকতর সংশোধন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি নেহরু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সরকার কোনপ্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদ বা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বরদাস্ত করবে না।

অসমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে নেফা (NEFA—North East Frontier Agency) বা উত্তর পূর্ব সীমান্ত অনুসংগঠন সৃষ্টি নেহরু ও ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলউইনের উপজাতি নীতির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। অসমের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের বাইরে একটি বিশেষ প্রশাসনের অধীনে নেফা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে নেফা অরুণাচল প্রদেশ নাম প্রাপ্ত হয় এবং পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পায়। একদিকে যখন নেফা ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, সমস্যা দেখা দেয় অসমের প্রত্যক্ষ এক্তিয়ার ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলে। সমতলভূমির বাংলা ভাষী ও অসমীয়া ভাষী অধিবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য উপজাতি সম্প্রদায়ের কোন সাংস্কৃতিক সৌসাদৃশ্য ছিল না। উপরন্তু

উপজাতি গোষ্ঠীগুলির আশঙ্কা ছিল অসমীকরণের নীতি তাদের উপজাতি সত্ত্বার বিলোপ সাধন করে অসমীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের একীভূত করবে। উপজাতি এলাকায় কর্মরত অ-উপজাতীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠাভিমান তাদের কাছে ছিল বিশেষ আপত্তিজনক। উপজাতি সম্প্রদায়গুলির ক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিল তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে অসম সরকারের প্রযত্ন ও সহানুভূতির অভাব। অসম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে উপজাতি জনসমূহের একাংশের মধ্যে পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবি দানা বাঁধে। ১৯৬০-এর দশকে এই দাবি আরো জোরদার হয়ে ওঠে যখন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে। ১৯৬০ সালে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলি একত্রে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সম্মেলন (All Party Hill Leaders' Conference) আহ্বান করে এবং পুনরায় ভারতীয় সংঘের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে। অসম সরকারি ভাষা আইন যখন প্রশাসনিক কার্যে উপজাতীয় ভাষাগুলির ব্যবহারের দাবিকে নস্যাৎ করে অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়, তখন উপজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পৃথক রাজ্যের দাবি গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৬২-র নির্বাচনে বিধানসভার অধিকাংশ আসনই পৃথক রাজ্যের প্রবক্তাদের দখলে চলে যায় যাঁরা বিধানসভা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৬৯ সালে অসম থেকে মেঘালয়কে বিচ্ছিন্ন করে "রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি রাজ্য" হিসাবে গঠন করা হয়, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি ব্যতীত স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। মেঘালয়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা অসম সরকারের দায়িত্ব থেকে যায়।

নাগাল্যাণ্ড :

নাগা সম্প্রদায় অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বরাবর নাগা পর্বতের অধিবাসী। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সংখ্যায় পাঁচ লক্ষ নাগা সম্প্রদায় ভারতীয় জনসংখ্যার ০.১ শতাংশেরও কম, এবং বিভিন্নভাষী উপজাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারত সরকার নাগা উপজাতিগুলিকে অসমের সঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নাগা নেতৃবৃন্দের একাংশ এই সমাকলন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে এবং ফিজোর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দাবিতে সহিংস অভ্যুত্থানের পথে যায়। নেহরুর সামগ্রিক উপজাতি সংক্রান্তনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে ভারত সরকার এক দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। দৃঢ় ভাষায় সরকার জানিয়ে দেয় যে নাগা অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি এবং সহিংস আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। ১৯৫৫ সালে নাগাল্যাণ্ডে আইন শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে ভারত সরকার সেনা পাঠিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করে। পাশাপাশি নেহরু সরকার নরমপন্থী নাগা নেতৃবৃন্দের দিকে সৌহার্দের হাত বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৬৩ সালে ভারতীয় সংঘের অভ্যন্তরে পৃথক নাগাল্যাণ্ড রাজ্য সৃষ্টি করা হয়।

নাগা অভ্যুত্থানের কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিজো জেলায় অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনদের মদতে এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার জন্ম হয়, কিন্তু এই প্রবণতা তরুণ মিজো নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয় কারণ তাঁরা মিজো সমাজের গণতন্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অসম বিধানমণ্ডগুলীতে পর্যাপ্ত মিজো প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলি নিয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু অসমীয় ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেলে লালডেঙ্গার সভাপতিত্বে মিজো জাতীয় মোর্চা গঠিত হয় (Mizo National Front)। এই মোর্চা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে মিজোরাম একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠিত হয়।

২.১১ গণতন্ত্রের পথে ভারত

নেহেরু পরিচালিত স্বাধীন ভারতের রাজনীতির দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ, ১৯৫১ পরবর্তী যুগটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা যুগ। এই পর্বে অর্জিত কৃতিত্বসমূহের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে দৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা করা। রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি আঞ্চলিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক পর্বের সমাধা করেছিল। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি, সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা ভারতীয় রাজনীতিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল তা দক্ষতার সঙ্গে প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক সরকারের। আবার অদক্ষভাবে মোকাবিলা করলে এই সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিত যা অনায়াসেই নতুন রাষ্ট্রটির সংহতি বিপন্ন করত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচনার গুরুত্ব সহজেই চোখে পড়ে।

২.১১.১ গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে ঃ

ভারতবর্ষ সম্ভবত একমাত্র উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অবসানে গণতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তটিঅবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়েছিল। প্রথমত, কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছিল যে গণতন্ত্র ও নাগরিক সভ্যতার ধারণা ও আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজে উদ্ভূত। এই সমাজের বিশেষ পরিস্থিতি থেকে এই ধারণাগুলিকে কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, ধর্ম, শ্রেণী ও জাত-পাতের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত সমাজে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা সাম্যতন্ত্র শিকড় গাড়তে পারে না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের মত দারিদ্র কন্টকিত দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অচল কারণ এহেন অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ গণতান্ত্রিক

অধিকারের চেয়ে বেশি আগ্রহী হবে "এক গ্রাস অন্নে" এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের কাছে হবে অর্থহীন যদি তা তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু ভাববাদীতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিলেন যে, আজ না হোক কাল দরিদ্র জনগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নিজেদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে যা তাদের প্রয়োজন-গুলির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। যাই হোক, এইভাবে সমস্ত বিরোধিতা নস্যাৎ করে ভারতীয় গণ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার অঙ্গীকার নেন, এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

২.১১.২ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ঃ

সংবিধান ভারতের জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিধান দেয়। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র নেতারা কিভাবে গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেন এবং নেহরুর যুগে এই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার আগে স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

(ক) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগে ধীরে, পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতঙৃত্ব দান করেছিল এবং স্বাধীন ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিল। অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটেছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সূচনা হয়েছি ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য আবেদন নিবেদনকারী একটি সংঘবদ্ধ শিরোমণি গোষ্ঠীর সংগঠন হিসাবে। ১৯২০ সালের পর কংগ্রেস হয়ে ওঠে একটি গণ-সংগঠন যা একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জনগণকে সক্রিয় করার কর্মসূচী গ্রহণ করে ও অপরদিকে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনে অংশ নিতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চালু হলে ব্রিটিশ শাসনাধীন অধিকাংশ প্রদেশে শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসের তৃতীয় পর্যায়ের বিবর্তন সূচিত হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে স্বাধন ভারতের শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান কংগ্রেসের সামনে সব থেকে বড় যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তা হল আদৌ একটি দল হিসাবে কংগ্রেসো অস্তিত্ব থাকবে কি না। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছিলেন নিছক একটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করার জন্য নয়, জাতীয় স্বার্থের মুখপাত্রস্বরূপ গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের হায়িার রূপেও বটে। গঠনমূলক কর্বসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশীর রাজনীতি বহির্ভূত অংশ—চরকায় সুতো

কাটা ও খাদি পরিধানে উৎসাহ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও অস্পৃশ্য জাতিগুলির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিনগুলিতে গঠনমূলক কর্বসৌচীর একটা বাস্তব উপযোগিতা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির মুখে পড়ে যখন কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলি পিছু হটতে বাধ্য হত তখন এই কর্মসূচী কংগ্রেস কর্মীদের সক্রিয় রাখতে সাহায্য করত। গান্ধী চেয়েছিলেন যে এই রাজনীতি বহির্ভূত কর্মসূচীই কংগ্রেসের সামগ্রিক কর্মসূচী হয়ে উঠুক। তিনি সম্ভবত দলীয় রাজনীতি ও আন্দোলনের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। তাঁর কাছে কংগ্রেসের অর্থ ছিল জাতির সামগ্রিক সেবামূলক কাজ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়। তগে বংগ্রেসের অপর কোন নেতাই গান্ধীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। কংগ্রেসের মত একটি শক্তিশালী রাজনৈকি যন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে কেউই বড় একটা আগ্রহী ছিলেন না। গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্বা পেশ করার আগেই কংগ্রেসের সধারণ সম্পাদক শঙ্কররাও দেও একটি দলীয় বিজ্ঞপ্তিতে বলেন সংকট ও পরীক্ষার আগামী দিনগুলিতে ভারতের ঐক্য ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন মেটাতে পারে একটি ‘‘বৃহৎ রাজনৈতিক দল’’। অতএব কংগ্রেসের ধারাবাহিকতার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গংগ্রেস সেই সময়কার সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য রানৈতিক দল হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখল।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি বণ সসংগঠন যার চাঁদাভিত্তিক সদস্যপদ দু’টি শ্রেণীতে বিভক্ত। সাংগঠনিক দিক থেকে এই দল পদমর্যাদা অনুযায়ী নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্নে আঞ্চলিক কমিটি, তার উপর জেলা কমিটি, এবং জেলা কমিটির উপর রাজ্য কমিটি। রাজ্য কমিটির উপর সর্বভারতীয় কমিটি যাী শীর্ষে একজন নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। নেহরুর আমলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সংসদীয় পর্ষৎ দলের সদস্যদের রাজ্য বিধানমণ্ডলী ও সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করত। নেহরুর সময় এই আনষ্ঠানিক গঠন কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল আঞ্চলিক থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত গোষ্ঠীগত সম্পর্কের শৃঙ্খলা। প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কমিটির নিয়ন্ত্রণের জন্য গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা যেত। দলের অভ্যন্তরে এই উপদলীয় বিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল রাজ্যস্তরে সরকার গঠনের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতটি রাজ্যেই দল দু’টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ত— একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যারা সরকার এবং কখনো কখনো দলীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করত এবং একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী যারা দলীয় সংগঠনকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে লিপ্ত হত। সুতরাং ১৯৫০ ও ’৬০-এর দশকে কংগ্রেস নীতির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের দ্বারাই চাতি হত। সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে এসে পরিসমাপ্ত হত যেখানে ১৯৫-৫১-র পর থেকে নেহরু নীতি ও রাজনীতির অবিসংবাদিত কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐ সময় জাতীয় নেতৃত্বকে ‘‘হাইকমান্ড’’

বলে অভিহিত করা হত, এবং অন্তর্ভুক্ত হতেন নেহরুর ঘনিষ্ঠ রাজনীতিবিদরা। রাজ্যস্তরে গোষ্ঠী সংঘাত যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে দলীয় সংহতিকে বিপন্ন করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করত, তখন নেহরুর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত রাজনীতিবিদরা দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে দলীয় সংহতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুরক্ষিত করতেন।

সাম্রাজ্যবাদের অবসানে কংগ্রেস যখন স্বাধীন ভারতের শাসকদল রূপে প্রতিষ্ঠিত হল তার সামনে সব থেকে বড় প্রশ্ন ছিল দলীয় নেতৃত্ব ও সরকারের সম্পর্ক। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে নেহরু যখন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন তখনই তিনি দলীয় সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দেন কারণ সরকারের নেতা ও দলীয় সভাপতির যুগ্ম দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর উত্তরাধিকারী জে, বি কৃপালনী দাবি করেছিলেন যে সরকারি নীতি নির্ধারণে দলের সভাপতির ও কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবে এবং এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও সরকারি ক্ষমতায় আসীন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে সরকারি কার্যাবলী ও নথিপত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সরকার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। দল নিঃসন্দেহে দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও লক্ষ্য স্থির করে দেবে কিন্তু কখনোই শাসনতন্ত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না। সংবিধান অনুযায়ী সরকার নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, দলের কাছে নয়। সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে দলের এই গৌণ অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকার করে কৃপালনী দুই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন (নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর বক্তব্য ছিল যে সরকার ও দলের কোন সমন্বয় নেই এবং সভাপতি হিসাবে তাঁর অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি মন্ত্রীত্বে আসীন সদস্যদের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেননি। এক বছরের জন্য কৃপালনীর স্থলে অভিষিক্ত হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পট্টভী সিতারামাইয়া। এঁরা কেউই সরকারের সঙ্গে সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব বা সমতার প্রশ্ন তোলেননি এবং সভাপতির কার্যাবলী সাংগঠনিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবে এই বিতর্ক পাকাপাকিভাবে মিটে যায়নি।

১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে দলীয় সভাপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেহরুর সঙ্গে দলের দক্ষিণপন্থীদের সংঘাত প্রকাশ্যে আসে এবং এক বছর ধরে চলে। এই দ্বন্দ্বে নীতি ও আদর্শগত প্রশ্ন জড়িত ছিল ঠিকই কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নতুন পদাধিকারীরা দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনজন প্রার্থী দলের সভাপতিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন—সর্দার প্যাটেল সমর্থিত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, নেহরু সমর্থিত জে, বি কৃপালনী এবং শঙ্কর রাও দেও। ট্যাণ্ডনের রক্ষণশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নেহরু তাঁর বিরোধী ছিলেন, এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে

দেন যে ট্যাণ্ডন নির্বাচিত হলে নেহরুর পক্ষে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরূপে থাকা, এমন কি সরকার চালানো পর্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। অপরদিকে ট্যাণ্ডনের সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে তাঁর নির্বাচন নেহরুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক হবে এবং নেহরুর আর্থ সামাজিক ও পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন আনবে। ট্যাণ্ডন সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি তাঁর অনুগামীদের দিয়ে পূর্ণ করা হয়।

কৃপালনী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে ট্যাণ্ডনের সক্রিয় বিরোধিতা করতে থাকেন। এর ফলে বিস্তর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। অবশেষে কর্মসমিতির নির্দেশানুসারে তিনি এই সংগঠন ভেঙে দেন। ১৯৫১-র শেষের দিকে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে কিষান মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। দক্ষিণপন্থী নেতারা প্রগতিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করার সাফল্যে বিভোর। নেহরু সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধেও একই অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

ট্যাণ্ডন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর দল ও সরকারের সম্পর্কের প্রশ্নটি আবার একবার উঠে আসে। ট্যাণ্ডন ও তাঁর অনুগামীরা দাবী করেন যে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ দলীয় আজ্ঞা কার্যকরী করবে এবং সরকারি নীতি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে দলের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। এই পর্যায়ে নেহরু দলের অভ্যন্তরে সমস্ত বিরোধিতা নির্মূল করতে মরীয়া হয়ে ওঠেন। প্যাটেলের মৃত্যু (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০) হলে দল নেহরুর কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তিনি সরাসরি দলীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করেন। এই সময় একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনৈতিক সংগ্রামী রূপে নেহরুর উত্থান সম্পূর্ণ হয়। অবিচল পদক্ষেপে তিনি দলীয় সংঘাতের স্থায়ী নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হন। সম্ভবত তাঁর লক্ষ্য ছিল আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা কারণ এই মনোনয়নগুলিই বিধানমণ্ডলী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার চরিত্র নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল দৃঢ় ভাষায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে দলের অভ্যন্তরে দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করা এবং আরো এক পা এগিয়ে কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্রব নিষিদ্ধ করা। দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি "প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির" সদস্যদের আহ্বান জানান। আসলে নেহরু চেয়েছিলেন দলীয় সংহতি ব্যাহত না করে দল বা আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দক্ষিণপন্থীদের আধিপত্য খর্ব করা। অসামান্য নৈপুণ্য, দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক প্রতিভার বলে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর আর্থ সামাজিক ও পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন করিয়ে নেন। অতঃপর তিনি দলের উপর সামগ্রিক কর্তৃত্ব দাবি করেন : হয় ট্যাণ্ডন কর্মসমিতির পুনর্গঠন করবেন নচেৎ নেহরু পদত্যাগ করবেন। এই দাবি পেশ করে নেহরু পরোক্ষভাবে ট্যাণ্ডনের বহিষ্কারের পথটি প্রস্তুত করেছিলেন। ৬ই আগস্ট ১৯৫১ নেহরু কর্মসমিতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতি থেকে পদত্যাগ করে সদস্যদের বাধ্য করেন তাঁর এবং ট্যাণ্ডনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে। সদস্যদের

মধ্যে দ্বিমতের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁরা এবং ট্যান্ডন নিজেও পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন যে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে নেহরুর নেতৃত্ব অপরিহার্য ছিল। অতএব ব্যাণ্ডন নেহরুর পদত্যাগ স্বীকার না করে নিজেই ইস্তফা দেন। নেহরু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। যদিও নীতিগতভাবে নেহরু একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীত্ব ও দলীয় সভাপতিত্বের বিরোধী ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন "বিশেষ পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়"। দলের অভ্যন্তরে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নেহরুর উত্থান সম্পূর্ণ হয়। আমৃত্যু তিনি দলের ও সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন।

(খ) ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ঃ

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিভিন্ন পর্যায়ের চরমপন্থী দল ও রাজনীতি স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ত্রিশের দশক থেকে বামপন্থী ধারা দুটি মূল স্রোতে বিভক্ত হয়ে পড়ে—সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট। স্বাধীনতার পর দুটি আন্দোলনই অসংখ্যবার বিভাজিত হয়েছে। ফলে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অ-কমিউনিষ্ট বাসেমর অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিভাজন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণামে ঘটেনি, ঘটেছে নীতিগত কারণে। বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের এবং বামপন্থী দলগুলির নিজেদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পার্থক্য ছিল। সমাজবাদী দলগুলি যেখানে শ্রমনিবিড় ছোট মাপের শিল্পের বিকাশ বেং বিকেন্দ্রীভূত যোজনা পদ্ধতির গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করেছিল, কমিউনিস্টদের দাবি ছিল কংগ্রেস অনুসৃত শিল্পায়নের নীতির থেকে আরো ব্যাপক হারে ভারী শিল্পের বিকাশ। আবার দক্ষিণ এশিয় রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীন স্বতন্ত্র্য ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সমাজবাদীরা আন্তর্জাতিক সমস্যায় একটি বিশিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাকিয়ে ছিল বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বের দিকে এবং সেই দ্বন্দ্বে তারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার নীতি অনুসরণ করেছিল। সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনগুলির সমর্থন প্রধানত আঞ্চলিক। কমিউনিস্ট আন্দোলন সেই সমস্ত অঞ্চলেই শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস দল আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি, যেমন কেরল, অন্ধ্র। অনুরূপভাবে সমাজবাদী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৪২-র ভারত ছাড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তরুণ সমাজতন্ত্রীরা। সুতরাং এই আঞ্চলিক সমর্থন উৎসারিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে, অর্থনৈতিক পেক্ষাপট থেকে নয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টির সব থেকে বড় সম্পদ ছিল অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য একনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান করেছিল

নেহরুর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে। কিন্তু সোভিয়েত নির্দেশে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকেই তারা বলতে শুরু করে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেকী (“ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়”)। ১৫ই আগস্টকে তারা জাতীয় প্রবঞ্চনার দিন হিসাবে চিহ্নিত করে বলে যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র পরিগ্রহ করেছে এবং নেহরু সাম্রাজ্যবাদের দালালস্বরূপ ফ্যাসিস্ট কায়দায় সরকার পরিচালনা করছেন। সংবিধানকে তারা বর্ণনা করে দাসত্বের সনদ রূপে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেয়। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনকে প্রলম্বিত করা হয়। হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন এখন ভারত বিরোধী আকার ধাণ করে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৫১ সালের শেষের দিকে যখন অজয় ঘোষ দলের সাধারণ সম্পাদক, স্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাদেররণনীতি পরিবর্তন করে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্বেকার নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী পিছিয়ে দেয় এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ভারতীয় গ্রামীণ শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট পৃথকীকরণের অভাব ও আঞ্চলিক স্তরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে বামপন্থী দলগুলির পক্ষে শুধুমাত্র দারিদ্র্য ও ভূমিহীন রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বরং তারা শ্রেণীসমষ্টিগত কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাই হোক, প্রথম সাদারণ নির্বাচনে দল সেইসব অঞ্চলেই মনোনিবেশ করেছিল যেখানে তার সমর্থন নিশ্চিত ছিল, অর্থাৎ, যে অঞ্চলগুলি পরবর্তীকালে অন্ধ্র ও কেরল বলে পরিচিতি হয়েছিল। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪.৬% ভোট পেয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট দল বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে উঠে আসে। এই ফলাফল থেকে মনে হয়েছিল যে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সম্ভবনা উজ্জ্বল। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ভারত রাষ্ট্রের চরত্রি, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের অপরিহার্যতা, নেহরু সরকারের গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রতি দলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরীণ নীতিগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কামিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক অবস্থানে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। প্রথম, ১৯৫৩ সালের মাদুরাই অধিবেশনে দল স্বীকার করে নেয় যে ভারত সরকার একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে কিন্তু পুনরাবৃত্তি করে বলে যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার নীতি সমূহের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী নীতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। দ্বিতীয়, ১৯৫৬ সালের পালঘাট অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম গণরাজ্যের মর্যাদা দেয়। কিন্তু তারা বলে যে

সরকার জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করে পুঁজিবাদীর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী। সুতরাং "প্রতিক্রিয়াশীল" কংগ্রেস সরকারকে গদীচ্যুত করতে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তৃতীয়, ১৯৫৮ সালের অমৃতসর অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবঙ্গ এই অধিবেশনে আরো বলা হয় যে ক্ষমতায় এলে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করবে, এমনকি বিরোধী দলগুলির সমালোচনার অধিকারও স্বীকৃতি পায়। চতুর্থ, বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রতি সংগ্রাম ও সহযোগিতার দ্বৈতনীতি গ্রহণ করে।

আপাতদৃষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্যমত বজায় থাকলেও কিছু আন্তর্জাতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য আবার তীব্র আকার ধারণ করে। স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমালোচনা, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিভেদ এবং সবশেষে ১৯৬২-এর ইন্দো-চীন যুদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৯৬৪ সালে দক্ষিণপন্থী সোভিয়েত অনুগামী গোষ্ঠী সি.পি.আই. এবং বামপন্থী সি.পি.এম. দলের প্রকাশ ঘটে। ভারতের জাতীয় জীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিপনচন্দ্র বলেছেন যে কমিউনিস্টরা ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতা যথার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। এই কারণেই কিছু অঞ্চলের বাইরে বৃহত্তর বারতীয় জনজীবনে তাঁরা কোনো বড় মাপের প্রভাব ফেলতে পারেননি।

(গ) সমাজবাদী দল ঃ

সমাজবাদী দল তার জন্মলগ্ন (১৯৩৪) থেকেই কংগ্রেসের অঙ্গ ছিল যদি তার নিজস্ব পৃথক সংবিধান, সদস্যপদ, নিয়ম শঙ্খলা ও মতাদর্শ ছিল। স্বাধীনতার সময় সমাজবাদী দলের সব থেকে বড় সম্পদ ছিল তার নেতৃবৃন্দ—জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহতা, রামমনোহার লোহিয়া প্রমুখ। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে যখন কংগ্রেস নিয়ম করে যে তারা সদস্যরা এমন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না যার পৃথক সংবিধান ও নিয়মশৃঙ্খলা আছে, সমাজবাদীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে সমাজবাদীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল। কারণ কংগ্রেসের সর্বব্যাপী চরিত্রের মধ্যে মতপার্থক্য যথাযথ স্থান পেত। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল সাংগঠনিক ঐক্য আরোপ করা, আদর্শগত অভিন্নতা নয়। যাইহোক, ১৯৫১-৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদী দল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। প্রদত্ত ভোটের ১০.৬% লাভ করে লোকসভায় ১২টি আসন দখল করে। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে গঠিত কিষাণ মজদুর প্রজাপার্টি সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের দ্বারা কোনঠাসা হয়ে যাবার আশঙ্কায় ১৯৫২ সালে সমাজবাদী দল ও কিষান মজদুর প্রজাপার্টি একত্রিত হয়ে সমাজবাদী প্রজাপার্টি গঠন করে। গোড়া থেকেই নীতিগত ও গোষ্ঠী সংঘাত, অদক্ষ ও পরিবর্তনশীল নেতৃত্ব এই সংগঠনের সম্ভবনাকে ম্লান করে দিয়েছিল।

(ঘ) ভারতীয় জনসঙঘ ঃ

১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে জনসঙঘ তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে। এই দল মূলত একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন, অর্থাৎ, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে ঘিরে গঠিত একটি সংগঠন। এ ধরনের সংগঠনের সাধারণত কোন কর্মসূচি বা সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে না। আবরণস্বরূপ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি থাকে যা নির্বাচনী সুযোগ সুবিধার্থে অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক সুবিধার্থে ক্রমাগত পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই দল দক্ষিণপন্থী কারণ অর্থনীতির প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়নমূলক উপাদনগুলিকে শক্তিশালী না করে রাষ্ট্র ও সামজের সাম্প্রদায়িকীকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রকাশ্যে পচরার করার ক্ষেত্রে জনসঙেঘর দু'টি প্রধান বাধ্যবাধকতা ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ গরতান্ত্রিক রাজনীতিতে নির্বাচনে অংশগ্রশকারী একটি াজনৈতিক দল হিসাবে তার লক্ষ্য চিল অ-সাম্প্রদায়িকতার কোন গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা ছিল না। উপরন্তু নির্বাচন সক্রান্ত আইন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল।

২.১১.৩ নির্বাচনী পদ্ধতির সূচনা ঃ

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংবিধান কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রের পথে ভারতের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২) গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাধারণত মনে করা হয় যে এই নির্বাচন সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৃহত্তম পরীক্ষা নিরীক্ষা। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচনে ১৮ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত ছিল। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ একটি নির্বাচন কমিশনের উপর বর্তিত হয়েছিল এবং এই কমিশন নির্বাহিক, সসদীয় অথবা শাসকদলের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

ব্রিটিশ সংসদীয় পদ্ধতির অনুকরণে ভারতীয় সংবিধান প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচন ধার্য করে। কিন্তু কখনো কখনো প্রদানমন্ত্রীর উপদেশে রাষ্ট্রপতি সভার পাঁচ বছরের মেয়াদাবসানের আগেই নির্বাচন তলব করতে পারেন। যেহেতু অনেক ভারতীয়রই অক্ষরজ্ঞান নেই সেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দল, এমনকি নির্দল প্রার্থীদেরও নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়। ১৯৭১-র আগে পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হত।

নির্বাচনে অংশগ্রণকারী দল বা প্রার্থীদের নির্বাচনী রণনীতির প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ নির্বাচনী প্রচার। প্রধানত তিনটি উপায়ে একটি দল বা নির্দল প্রার্থী তার রাজনৈতিক বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে। প্রথম, প্রতিটি সুসংগঠিত দলই তাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সংবলিত ইস্তাহার ইংরাজী ও মাতৃভাষায় মুদ্রিত করে বিলি

করে, যেখানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের বিশিষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করা থাকে। দ্বিতীয়, গ্রামাঞ্চল ও শহরের রাজপথে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে তাঁদের নীতিগত অবস্থান বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয়, সর্বসমক্ষে অপ্রকাশ্য গূঢ় পন্থায় প্রার্থীরা সমর্থনের ভিত্তি দৃঢ় করেন। এক্ষেত্রে প্রচারকরা তাঁদের মুদ্রিত ঘোষণাপত্র ও প্রকাশ্য বিবৃতির বাইরে গিয়ে প্রার্থী ও নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাদের মধ্যে জাতপাতের বন্ধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, বিশেষ গ্রাম বা এলাকার উন্নয়নে তাঁর অবদান তুলে ধরেন অথবা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

অলোকসামান্য নেতাদের ব্যক্তিগত আবেদন থেকে শুরু করে শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতপাত ও গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য, প্রভৃতি ভারতীয় ভোটদাতাদের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রচারের পাদপ্রদীপে ছিলেন জওহরলাল নেহরু যিনি অসাধারণ উদ্যমে দলকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বাস্তবিক এই নির্বাচনের প্রতিটি স্তরেই নেহরুর উপস্থিতি ও প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু তৃণমূল স্তরে কিছু অন্যান্য বিবেচনাও অনুভূত হয়েছিল। কিছু প্রার্থী সফল হয়েছিলেন কারণ তাঁরা নেহরু ও গান্ধীর কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, আবার কিছু প্রার্থীকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল কারণ আঞ্চলিক প্রভাবের জন্য তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার টানাপোড়েনের সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের নীতি ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তাঁরা শিল্প ও কৃষির বর্ধিত সমগ্র উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দেখেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে দুরূহ। সমাজের দরিদ্রতর অংশের দৈনন্দিন উদ্বেগের বিষয় গ্রাসাচ্ছাদন, পানীয় জল, বাসস্থান ও কর্ম নিযুক্তি। দারিদ্র সীমার উপরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের স্বার্থ খামার জাত দ্রব্যের বাজার দর, সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা, নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বর্ষাকালে ব্যবহারযোগ্য সড়ক ও সেতু, শিক্ষা ও কর্ম-নিযুক্তি। আঞ্চলিক স্তরের সমস্ত রাজনীতিবিদই এই দাবি দাওয়াগুলির অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু দাবিদাওয়া পূরণে তাদের কৃতিত্ব হতাশাব্যঞ্জক। সুতরাং নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁরা এই সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত না করে জনগণকে ভাবতে বাধ্য করেন যে জাতির প্রকৃত সমস্য অন্ন বস্ত্র বা আশ্রয় নয়--- বরং পাকিস্তানের রণ দামামা, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অথবা (সাম্প্রতিককালে) অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের মত দলের প্রতি আনুগত্য ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতিকে চিহ্নিত করে না। ভারতবর্ষে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্ভবত কোন বৃহৎ জমিদার অথবা রাজন্য পরিবারের বংশধর অথবা জাতপাতের ভিত্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি, হয় নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করে নতুবা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মনোমত শর্তে সমর্থন বিক্রয় করে। আবার দলের

কোন সদস্য মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হলে অন্য দল অথবা নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দ্বিধা করেন না।

পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়েও বলা যায় যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রচার ও ফলাফলের দিক থেকে একক আধিপত্য বিস্তার করেছিল কংগ্রেস তার সর্বময় নেতা জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। নেহরুর প্রচারাভিযান মূলত রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। এর কারণ অংশত তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চেতনা এবং অংশত দলের অভ্যন্তরে তাঁর অভিজ্ঞতা। ভারতের ঐক্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির আশঙ্কাও তাঁকে এই রণনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল তাঁর আশঙ্কা প্রশমিত করেছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস লোকসভায় ৭৫% আসন দখল করে ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর ৬৮.৫% আসন দখল করে। শুধু চারটি রাজ্যে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি—মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, ওড়িষ্যা এবং পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব সংঘ। এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস নির্দল প্রার্থী ও ক্ষুদ্রতর স্থানীয় দলগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে তিনটি মুখ্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদ মাত্র ১০টি আসন দখল করেছিল। অপরদিকে কমিউনিস্ট দল এককভাবে ২৩টি আসন দখল করে। কৃপালনীর কিষান মজদুর প্রজাপার্টি ও সমাজবাদীরা একত্রে ২১টি আসন দখল করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সমাজবাদী ও কিষান মজদুর প্রজাপার্টি যেখানে ৩৯১ জন প্রার্থী দিয়েছিল, কমিউনিস্ট দল সেখানে মাত্র ৭০টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—যে আসনগুলিতে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়েছিল, তার অধিকাংশ আসনে তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচিত না হয়ে অন্যান্য দল ও নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। এই অন্যদলগুলি অধিকাংশই ছিল অবিমিশ্র আঞ্চলিক সংগঠন—পাঞ্জাবী শিখদের অকালী দল, বিহার উপজাতিদের ঝাড়খণ্ড, মাদ্রাজের দ্রাবিড় দলসমূহ, এবং ওড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ। সফল নির্দল প্রার্থীরা সকলেই প্রায় স্থানীয় মানুষ যাঁরা কোন মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ তুলে ধরেছিলেন। এহেন দল ও প্রার্থীদের সাফল্য একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল—সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কি যথার্থই একটি সর্বভারতীয় রাজনীতির চালিকাশক্তি হতে পারবে?

১৯৫২ সালের পর নেহরুর আমলে আরো দুটি নির্বাচন হয়েছে, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে। উভয়ক্ষেত্রেই ভোটদাতাদের সংখ্যা বেড়েছিল। ১৯৫১-৫২তে ৪৬% শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ৪৭% এবং ১৯৬২ সালে প্রায় ৫৪%। দুটি নির্বাচনেই কংগ্রেস লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল—দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচনে ৩৭১ টি আসন দখল করেছিল এবং তৃতীয় নির্বাচনে ৩৫৮টি। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট দল কেরলে বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার গঠন করে।

২.১২ উপসংহার

স্বাধীন ভারতে নেহরু আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এই যুগের সব থেকে বড় কৃতিত্ব ছিল সদ্যজাত ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দান। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিতুলনার প্রলোভন এড়ানো কঠিন। আজ যখন ভারতবর্ষে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, পাকিস্তান কিন্তু সামরিক শাসনে ধুঁকছে। ভারতীয় রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রনীতিতে যে স্বৈরাচারী প্রবণতা মতা তোলেনি, তা নয়। (উদাহরণস্বরূপ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের কথা মনে করা যেতে পারে।) কিন্তু তাকে পরাস্ত করতে সামরিক শাসন জারী করার প্রয়োজন হয়নি, গণতন্ত্রের অস্ত্র দিয়েই এই প্রবণতাকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়েছে। গণতন্ত্রের এই সাফল্যের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে নেহরু ও সমকালীন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতাদের প্রাপ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে যখন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ আতাতয়ীর গুলিতে প্রাণ হানার, ভারতবর্ষ তখন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল —প্রতিতুলনা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মত। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে গণতন্ত্রের এই সাফল্যের কতকগুলি সামাজিক কারণ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এক, ভারতবর্ষ সাম্রাজন্যবাদী শাসন কাঠামো অবিকৃত ও অখণ্ডিত আকার ধারণ করেছিল। যেটা পারিসব্বনের পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ পাকিস্তান ছিল খণ্ড রাজ্য। দুই, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ও তার ঐক্যমতের রাজনীতির একটা সর্বভারতীয় আবেদন ছিল। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে (নেহেরু যুগে) কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেছিল। ফলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। পাকিস্তান যে অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেফানে মুসলিম লীগের সমর্থনের ভিত্তি দুর্বলতম। সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একনি রাজনৈতিক দলের অভাব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সম্ভবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছিল। তিন, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরুর সময় স্বাধীন ভারতের সব থেকে বড় সম্পদ ছিল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বের পাশাপাশি সর্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি, গোবিন্দ বল্লভপন্থ, বি. জি. খের, ও মোরারজি দেশাইয়ের মাপের নেতৃবৃন্দ। সমকক্ষ নেতৃত্বের অভাব পাকিস্তানে রাজনীতি সম্ভবনাকে ম্লান করে দিয়েছিল।

২.১৩ অনুশীলনী

বিভাগ—ক (রচনাধর্মী প্রশ্ন)

১। অন্ধজর, বোম্বে ও পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান নেহরু সরকার ভাষাভিত্তিক রাজ পুনর্গঠনের সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন।

২। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ভারতীয় রাজনীতিতে কিরূপ বিভাজনের সৃষ্টি করে?

৩। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতির কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

বিভাগ—খ (সংক্ষিপ্ত বিষয়মুখী প্রশ্ন)

১। নেহরুর উপজাতি সংক্রান্ত নীতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল?

২। নেহরু কিভাবে কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকারের বিরোধের নিষ্পত্তি করেছিলেন সংক্ষেপে লিখুন।

৩। ১৯৪৭-১৯৬৪ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bipa Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee : India After Independence (1999).

২. Paul Bras : The Politics of India Since Independence (1999).

৩. W. H. Morris Jones : The Government and Politics of India (1967).

৪. Zoya Hasad (ed.) : Politics and the State in India (2000).

৫. Partha Chatterjee (ed.) State and Politics in Indai (1998).

৬. S. Gopal, Jawaharlal Nehru : A Biography, Vols. 2 and 3 (1989).

৭। দুর্গাদাস বসু, ভারতের সংবিধান পরিচয় (1994)

৮. Sujata Bose and Ayesha Jalal, Modern South Asia (1998).